ত্রিসন্ধি

[Intended for class V. of H. E. & M. E. Schools
in Eastern Bengal]

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, বি. এ.

S. K. LAHIRI AND CO.
56, COLLEGE STREET, CALCUTTA,
1916

মূল্য ছয় আনা মাত্র

PREFACE

"Trisandhi"—literally means, the union of the three, i.e. the Hindu, the Mahomedan and the Christian. This book has been prepared in accordance with the vernacular curriculum prescribed for class V in High and Middle English Schools, in Eastern Bengal; and as the name signifies, has been representative, as far as possible, of the three cultures which rule the life of the Bengali people at the present day. The curriculum prescribed has been strictly followed, but with a definite plan in view, the plan of representing the three cultures through the medium of simple and interesting lessons, so that no one among the three may be given undue prominence.

The connexion of the author, as a teacher, with Sir Rabindranath Tagore's school at Santiniketan, Bolepur, for eleven years or more, enabled him to have a first-hand knowledge and experience of the requirements of the boys and made him think of preparing a book, in which the three cultures, the Hindu, the Mahomedan and the Christian, would be represented.

In moral stories, therefore, anecdotes have not simply been chosen from Hindu history and Hindu life, but equally from Mahomedan history. In poetry, three poems have been composed by the author, the subjects being taken from the Koran, the Bostan of the poet Sadi, and the Mahomedan history of India. The first lesson of the book is about Sultan Mahmud and the Kingdom of Gazni and

gives a picture, through stories, of the splendid literary life and culture at the court of Gazni. It may help to remove the misconception and sometimes the prejudice that may naturally arise in the minds of young Hindu boys, when they read about Mahmud of Gazni's invasions in Indian history and think of him and the Mahomedans as a band of fanatics, knowing nothing of the great history and culture that is behind them. Similarly, Mahomedan boys, loving their Sadi and Firdusi, ought to have some ideas of the ancient Hindu literature, of the great Mahabharata. Two moral lessons have therefore been written from the Mahabharata.

The Christian side has not been illustrated from the history and literature of the west, but from the present-day history of the British rule in India. The influence of the British rule and its manysided results, have been shown by means of (i) a short biographical sketch of Rajah Rammohan Ray, the greatest product of British rule and the influence of western culture (ii) a lesson on the two greatest benefits we are enjoying from British rule, viz, sanitation and education, the spread of charitable hospitals and of schools and colleges.

Perhaps, a word ought to be added about the selection of poetry, which covers a wide range. The selection has been made from the earliest bards, Krittibas and Kashiramdas, from mediæval poets like Lochandas, Vrindabandas, Bharat Chandra and Mukundaram and from moderns such as, Hemchandra Bannerji, Krishna Chandra Majumdar and Sir Rabindranath Tagore. The author owes a deep debt of gratitude to the latter, for

having kindly permitted to put in, three of his poems, in this book. Perhaps no objection will be raised, on the score of language, for going back to old poetry. The language of old Bengali poetry can never be said to be antiquated, rather it is wonderfully fresh and modern. There may be a few words which are archaic and need to be explained. A few explanatory notes are given at the back of the book.

In conclusion, the author begs to submit that he has spared himself no pains to make the book, as suitable as possible, to the needs of the students, for whom it is intended and has made the style easy and the language, chaste and elegant. Special attention has been paid to make the book helpful and interesting to the Mahomedan boys, whose requirements are very liable to be forgotten, when one does not bear in mind that they form an overwhelming majority in the schools of Eastern Bengal.

AJIT KUMAR CHAKRAVARTY

CONTENTS

PROSE

POETRY

ত্রিসন্ধি

সুলতান মাহমুদ ও গজ্‌নি রাজ্য।

সুলতান মাহমুদ যে বহুবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা এই কথা অবগত হইয়াছি। ইহাতে আমরা মাহমুদের চরিত্রের ও বিবিধ সদ্‌গুণরাশির কোন পরিচয় প্রাপ্ত হই না। মুসলমানগণ এক সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, এই কথা আমরা ইতিহাসে শিক্ষা করি; কিন্তু তাঁহাদিগের পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না।

সুলতান মাহমুদ তুর্ক ক্রীতদাস আলাপ্‌টিগীন কর্ত্তৃক ৯৬২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত গজ্‌নি রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। এই সময়ে গজ্‌নি প্রভৃতি স্থানে কবি, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিদ্বান ব্যক্তিগণের সমাগমে পারস্য সাহিত্য ও ইতিহাস যেরূপ অলঙ্কৃত হইয়াছিল, এরূপ অপর কোন যুগে হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। সুলতান মাহমুদ রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বিস্তারেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজসভায় বহু শ্রেষ্ঠ কবি ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন।

আবিসেনা, অল্‌বিরুনি নামক ঐতিহাসিক, আবু মসিহি নামক দার্শনিক ও অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ কোয়ার্জম নামক স্থানে মমুনের রাজসভায় বাস করিতেছিলেন। মমুনের সহিত

সুলতান মাহমুদের তখন বিবাদ ঘটায় মাহমুদ তাঁহার অধিকাংশ রাজ্য অধিকার করিয়া অবশেষে তাঁহাকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র প্রেরণ করেন ঃ—

কোয়ার্জম-শাহের অধীনে অমুক অমুক পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, আমি এরূপ শ্রুত হইয়াছি। তাঁহাদিগকে অবিলম্বে আপনি আমার রাজধানীতে প্রেরণ করিবেন। তাঁহাদিগের বিদ্যা ও বুদ্ধিদ্বারা লাভবান হইব, আমাদের এইরূপ বাসনা। সুতরাং আপনার নিকট এবিষয়ে আনুকূল্য ভিক্ষা করিতেছি।

মমুন পত্র পাইয়া বুঝিলেন যে, এ পত্র অনুনয়-পত্র নহে, ইহা আদেশ-পত্র। তৎক্ষণাৎ তাঁহার পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া তিনি কহিলেন, "সুলতান মাহমুদের ক্ষমতা যথেষ্ট। তাঁহার শক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার সামর্থ্য আমার নাই। সুতরাং, এ সম্বন্ধে আপনারা কি বলেন ?" অল্‌বিরুনি এবং অন্যান্য দুই চারিজন পণ্ডিত যাইতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু বিজ্ঞান-পারদর্শী আবিসেনা ও দার্শনিক পণ্ডিত মসিহি যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সুতরাং তাঁহারা মমুনের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। পথিমধ্যে মরুভূমে প্রচণ্ড ঝটিকায় উত্তপ্ত বালুকাঘাতে মসিহি প্রাণত্যাগ করেন। আবিসেনা বহু কষ্টে গুরগান নামক এক নূতন রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তথাকার অধিপতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সুলতান মাহমুদ সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি তাঁহার প্রতিকৃতি

অঙ্কিত করাইয়া সর্ব্বত্র তাহা প্রচারিত করিয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনিবার আদেশ ঘোষণা করিলেন। গুরগানের অধিপতি তাঁহার সৎগুণে মুগ্ধ হইয়া মাহমুদের আদেশ সত্বেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না।

আবিসেনা আসিলেন না বটে, কিন্তু অল্‌বিরুনি সুলতান মাহমুদের সভায় আসিয়া যোগদান করিলেন। সুলতান মাহমুদ তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই। একদিবস চতুর্দ্বারবতী গ্রীষ্ম-বাটিকায় যখন সুলতান মাহমুদ বিশ্রাম করিতেছেন, তখন কোন্ দ্বার দিয়া তিনি বাহির হইবেন, গণনা করিয়া অল্‌বিরুনিকে তাহা স্থির করিতে তিনি অনুরোধ করিলেন। অল্‌বিরুনি এক কাগজখণ্ডে গণনা-ফল লিখিয়া শয্যানিম্নে তাহা সংস্থাপিত করিলেন। তখন সুলতান তাঁহার অজ্ঞাতসারে প্রাচীর-মধ্যে বিবর রচনা পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বহির্গত হইলেন। তৎপরে অল্‌বিরুনির লিখিত ভবিষ্যৎ-লিপি পাঠ করিয়া দেখা গেল যে, তিনিও সেই কথাই লিখিয়া রাখিয়াছেন। মাহমুদ ক্রোধে তাঁহাকে প্রাচীর হইতে নিম্নে নিক্ষিপ্ত করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু একটি মশারিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া অল্‌বিরুনি অক্ষত রহিলেন। সুলতানের সম্মুখে আনীত হইলে সুলতান তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এরূপ দণ্ডের বিষয় তিনি পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত ছিলেন কি না। তিনি তাঁহার লিপি উদ্ঘাটন পূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেখাইলেন যে, প্রাচীর হইতে নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইবার এবং দৈবক্রমে রক্ষা

পাইবার সকল কথাই তাহাতে লিখিত আছে। ইহার পরে সুলতান তাঁহাকে প্রায় ছয়মাস কাল কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং অবশেষে তাঁহার মন্ত্রীর অনুরোধে তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন। স্বর্ণাস্তরশোভিত অশ্ব, সুন্দর পরিচ্ছদ ও সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা, এবং ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী প্রভৃতি তাঁহার সম্মানার্থ প্রেরণ করিয়া সুলতান তাঁহার কারাবাসের দুঃখমোচন করিলেন। অল্‌বিরুনি-লিখিত ইতিবৃত্ত হইতেই গজ্‌নি-রাজ্যের ও তৎকালীন ইতিহাসের সকল বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

সুলতান মাহমুদ যদিচ সামরিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া অধিকাংশ সময়ে কার্য্য করিতেন, তথাপি তাঁহার অসাধারণ রসগ্রাহিতা ছিল। তিনি স্বয়ং কাব্য রচনা করিতেন এবং রসপূর্ণ সুললিত রচনা দর্শন করিলে সর্ব্বাগ্রে তাহার সমাদর করিতেন। তাঁহার সভাকবিগণের মধ্যে কবি ফর্দ্দুসির খ্যাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। একদা তাঁহার রাজসভায় নিশাপুর হইতে একজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ফর্দ্দুসি। কবিদল তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন যে, তাঁহারা সকলেই রাজকবি; ফর্দ্দুসি যদি ঐ পদের প্রার্থী হয়েন তবে তাঁহাকে পাদপূরণ করিতে হইবে। তাঁহারা তিন জনে একটি কবিতার এক এক ছত্র বলিয়া যাইবেন, শেষ ছত্র ফর্দ্দুসিকে পূরণ করিতে হইবে। ফর্দ্দুসি এমন এক পুরাণ-কথা উত্থাপন করিয়া পাদপূরণ করিলেন যাহা উক্ত কবিগণের অপরিজ্ঞাত ছিল। তাঁহারা তাঁহাকে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি গল্পচ্ছলে

তাঁহাদের অনধিগত পারস্য পুরাণ কহিয়া গেলেন—তাঁহারা ফর্দ্দুসীর আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্য দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি রাজকবিগণ মধ্যে সম্মানার্হ স্থান লাভ করিলেন।

সুলতান মাহমুদ তাঁহাকে প্রচুর অর্থে পুরস্কৃত করিবেন, এই প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়া ফর্দ্দুসি "শাহ নামা" নামক সুবিখ্যাত মহাকাব্যে পারস্য রাজ-বংশাবলীর ইতিবৃত্ত-কথা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাকাব্য সমাপ্ত হইলে সুলতান প্রতিশ্রুত অর্থের অর্দ্ধেকেরও অল্প পরিমাণ অর্থ তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। ফর্দ্দুসি মর্ম্মাহত হইয়া স্নানালয়ে গমন করিলেন এবং স্নান হইতে প্রত্যাগমন কালে সরবৎ ক্রয় করিলেন। তৎপরে সেই সমস্ত অর্থ অবহেলায় স্নানাগারের অধ্যক্ষ ও সরবৎ-বিক্রেতার মধ্যে ভাগ করিয়া বিতরণ করিলেন। সুলতানের বিরাগভাজন হইবেন বলিয়া তিনি রাত্রিযোগে গজ্‌নি ত্যাগ করিয়া হিরাটে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় এক পুস্তকালয়ে ছয়মাস কাল লুক্কায়িত রহিলেন। তৎপরে সেই স্থান হইতে অন্যত্র এক রাজার আশ্রয়ে গিয়া মাহমুদের সম্বন্ধে এক সুতীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ কাব্য রচনা করিলেন। সেই রাজা তাঁহাকে লক্ষ মুদ্রা দিয়া সেই ব্যঙ্গ-কাব্যখানি ক্রয় করিলেন এবং সুলতান মাহমুদের ভয়ে তাহা বিনষ্ট করিলেন। ফর্দ্দুসিকে তিনি বুঝাইলেন যে, সুলতান মাহমুদ গুণগ্রাহী; তিনি তাঁহার কৃতিত্বের সম্মান নিশ্চয় প্রদান করিবেন এবং যথোপযুক্ত ভাবে তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবেন। কারণ, তাঁহার মহাকাব্যের সমতুল্য কাব্য জগতে নাই।

ইহার পর মাহমুদ যখন ভারতবর্ষ-আক্রমণ হইতে প্রত্যাগত হইতেছেন, তখন পথিমধ্যে একদা এক বিদ্রোহী রাজা তাঁহাকে বাধা দিবার উপক্রম করিলে তিনি তাঁহার দুর্গদ্বারে সসৈন্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়া একটি কবিতায় তাঁহাকে সন্ধির মর্ম্ম জ্ঞাপন করিলেন। সেই কবিতার দুই ছত্রের রচনা-চাতুর্য্য দর্শন করিয়া উল্লসিত হইয়া মাহমুদ উহা কাহার রচনা, জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী উত্তর করিল, কবি ফর্দ্দুসির। তখন কবির সহিত নিজ দুর্ব্ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া সুলতান লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "গজ্‌নিতে তাঁহার বিষয় আমাকে স্মরণ করাইও।"

রাজ-উষ্ট্রপৃষ্ঠে সুলতানের বহুমূল্য উপঢৌকন ও প্রীতিপূর্ণ পত্র ফর্দ্দুসির নিকট প্রেরিত হইল। কিন্তু হায়! যখন এই রাজোপহার ফর্দ্দুসির ভবনে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টি সৎকার নিমিত্ত লোকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনিতেছে। নগরের বাহিরে যে স্থানে কবির প্রমোদকানন ছিল, তথায় তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত হইল।

কবির একটি মাত্র কন্যা ছিলেন; দূতগণ তাঁহাকেই সুলতানের উপহার দান করিতে গেল। কিন্তু তেজস্বিনী কবি-কন্যা সে অর্থ গ্রহণে সম্মতা হইলেন না।

পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণ।

প্রথম চিত্র।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের মুখে যদুবংশীয়দিগের নিধন ও শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, স্বয়ং মহাপ্রস্থান করিবার মানসে ধনঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ! কাল-প্রভাবেই মনুষ্যের ক্ষয় হয়, আমি শীঘ্রই মহাপ্রস্থান করিয়া কালের সেই অপরিহার্য্য নিয়ম পালন করিব, অবধারণ করিয়াছি। এক্ষণে তোমাদের যাহা কর্ত্তব্য হয়, স্থির কর।" যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদী, ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এইরূপে সকলে ইহসংসার পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অভিমন্যুনন্দন পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, পিতৃকুল ও মাতৃকুলের পরলোকগত আত্মীয়গণের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সমাপন পূর্ব্বক, মহাপ্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বেদব্যাস, নারদ, মার্কণ্ডেয় এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ, পাণ্ডবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন।

যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে সমুচিত সৎকার করিয়া এবং গুরুজন ও প্রজাগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, আভরণাদি পরিত্যাগ

পূর্ব্বক বল্কল পরিধান করিলেন। ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ এবং মনস্বিনী দ্রৌপদীও তাঁহার ন্যায় বেশ ধারণ করিলেন। পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী এইভাবে হস্তিনানগর হইতে বহির্গত হইলেন। কৌরবরমণীগণ তাঁহাদিগকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। একটি কুক্কুরও হস্তিনা হইতে পাণ্ডবদিগের অনুগামী হইল। সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, তাঁহার পশ্চাতে মহাবলশালী ভীমসেন, তাঁহার পশ্চাতে মহাবীর অর্জ্জুন, অর্জ্জুনের পশ্চাতে নকুল, নকুলের পশ্চাতে সহদেব, সহদেবের পশ্চাতে দ্রৌপদী, এবং তাঁহাদের সকলের পশ্চাতে কুক্কুরটী গমন করিতে লাগিল।

তাঁহারা অসংখ্য দেশ ও সাগর এবং বহু নদনদী অতিক্রম করিয়া দ্বারকাপুরীতে উপনীত হইলেন; এবং তথা হইতে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডুপুত্রগণ, পত্নীর সহিত ক্রমাগত উত্তরদিকে গমন করিতে করিতে, সম্মুখে বিশাল হিমগিরি দেখিতে পাইলেন। ক্রমে তাঁহারা মহোচ্চ হিমগিরিতে আরোহণ করিলেন; তখন সুমেরু পর্ব্বত তাঁহাদের নয়ন-পথে পতিত হইল। ত্বরায় হিমালয় অতিক্রম করিবার মানসে, তাঁহারা দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন। কিন্তু দ্রৌপদী নিতান্ত পথশ্রান্তিবশতঃ ভূতলে পতিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। দ্রৌপদীকে পতিতা হইতে দেখিয়া ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! দ্রৌপদী ত কখনও কোন অধর্ম্মাচরণ করেন নাই; তবে কি নিমিত্ত ধরাতলে

নিপতিতা হইলেন ?” যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন “ভ্রাতঃ! সকলকেই আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। দ্রৌপদী আমাদিগের মধ্যে অর্জ্জুনকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন করিতেন, সেই জন্যই তাঁহাকে ভূপতিতা হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইল।”

এই বলিয়া তিনি দ্রৌপদীর প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া একমনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া সহদেব ভূপতিত হইলেন। ভীমসেন সহদেবকে ভূতলে নিপতিত হইতে দেখিয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “মহারাজ! সহদেব নিরহঙ্কার হইয়া সর্ব্বদাই ভক্তির সহিত আমাদিগের সেবা করিয়াছেন; তবে কি কারণে ইঁহাকে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল ?” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ভীম! সহদেব সর্ব্বদাই আপনাকে বিজ্ঞ বলিয়া মনে করিত, সেই জ্ঞানাভিমানেই উহার পতন ঘটিল।”

কিছুকাল পরে নকুলও ভূপতিত হইলেন। নকুলকে পতিত হইতে দেখিয়া ভীমসেন প্রাণের আবেগে আবার যুধিষ্ঠিরকে নকুলের পতনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ভীম! নকুল ধার্ম্মিক ছিলেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। কিন্তু আমার তুল্য রূপবান নাই, নকুলের মনে এই এক প্রবল অভিমান ছিল। সেই রূপাভিমানেই উঁহাকে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল।” এই বলিয়া যুধিষ্ঠির নকুলকে সেই অবস্থায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবার চলিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই মহাবীর অর্জ্জুনও ভূতলশায়ী হইলেন। তখন বৃকোদর উদ্বেলিত শোকোচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! যিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরিহাসচ্ছলেও যিনি কদাপি মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করেন নাই, কি অপরাধে তাঁহাকে ভূতলে পতিত হইতে হইল?" যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, "ভাই! অর্জ্জুনের মনে বীরত্বের অভিমান ছিল। বীরত্বাভিমানী হইয়া অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি একদিনেই সকল শত্রু সংহার করিব। কিন্তু তিনি এই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ মহাবীর অর্জ্জুন অন্যান্য ধনুর্দ্ধরদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। এই সকল কারণেই উঁহার এই দশা ঘটিল।" এই বলিয়া যুধিষ্ঠির, ভীম ও কুক্কুরটীকে সঙ্গে লইয়া, পুনরায় শান্ত চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। এবার মহাবীর ভীমসেন স্বয়ংই কদলী বৃক্ষের ন্যায় ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। ধরাতলে পতিত হইয়াই তিনি আকুল চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার চিরানুগত দাস, কি অপরাধে আমার এই দশা ঘটিল?" ধর্ম্মরাজ কহিলেন, "ভীম! তুমি অন্যকে না দিয়া উপাদেয় বস্তু সকল স্বয়ং ভোজন করিতে, এবং তোমার ন্যায় বলবান্ লোক পৃথিবীতে আর নাই, তোমার মনে এই অহঙ্কার ছিল। ভাই! সেই অপরাধেই তোমাকে এই অবস্থা লাভ করিতে হইল।"

পাপ বিষতুল্য। যেরূপ, মানবদেহে বিন্দুমাত্র বিষ

প্রবিষ্ট হইলে দেহ বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সামান্য একটুকু পাপও অন্তরে পোষণ করিলে লোকের নিশ্চয়ই পতন ঘটে! নরহত্যা, মিথ্যাকথন, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি মহাপাপ সকল হইতে রক্ষা পাইয়াও কত লোক সামান্য একটু দুর্ব্বলতাবশতঃ পুণ্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়। পক্ষপাতিত্ব, জ্ঞানাভিমান, রূপাভিমান বীরত্বাভিমান, প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন এবং লোভ, ইহার একটিকেও সামান্য দোষ বলিয়া উপেক্ষা করা সঙ্গত নহে।

অতি ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র থাকিলে যেরূপ পূর্ণ কলসীর সমস্ত জলই নির্গত হইয়া যায়, সেইরূপ সামান্য মাত্র পাপও হৃদয়ের সমস্ত পুণ্যরাশি বিনষ্ট করে।

পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণ।

দ্বিতীয় চিত্র।

যখন দ্রৌপদী ও ভীমার্জ্জুনাদি সকলে স্বর্গারোহণে অসমর্থ হইয়া একে একে স্বর্গের পথেই জীবন হারাইলেন, তখন কেবল সেই কুক্কুরটী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিল।

যুধিষ্ঠির কুক্কুরটীকে সঙ্গে লইয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,

"মহারাজ! আপনি অবিলম্বে এই রথে সমারূঢ় হইয়া স্বর্গারোহণ করুন।" তখন যুধিষ্ঠির দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অমররাজ! সুকুমারী দ্রৌপদী ও আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ ধরাতলে নিপতিত হইয়াছেন, ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে আমার বাসনা নাই।" দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন, "সে কি মহারাজ! পাঞ্চালী ও আপনার ভ্রাতৃগণ কি এখনও ভূমিতলে পতিত হইয়া রহিয়াছেন? তাঁহারা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া আপনার পূর্ব্বেই অমরলোকে গমন করিয়াছেন। আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ, আপনার ভ্রাতৃগণ, ও দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলেই আপনাকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন; অতএব আপনি শীঘ্র রথারোহণ করুন।" ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "অমররাজ! এই কুক্কুর বহুদিন আমার সঙ্গে রহিয়াছে; ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কোথাও গমন করিতে পারি না। অতএব আপনি ইহাকেও আমার সহিত স্বর্গারোহণ করিতে অনুমতি করুন।" দেবরাজ কহিলেন, "ধর্ম্মনন্দন! পুণ্যের ফলে আপনার স্বর্গ ও অমরত্ব লাভ হইবে। কুক্কুর অতি অপবিত্র জন্তু; কুক্কুরের সহিত একত্র অবস্থান করিলেও পুণ্যফল বিনষ্ট হয়। অতএব মহারাজ! তাহার জন্য কালবিলম্ব না করিয়া স্বর্গে গমন করাই আপনার পক্ষে বিধেয়। কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে আপনার কিঞ্চিন্মাত্রও নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইবে না।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দেবরাজ! আশ্রিত জনকে পরিত্যাগ

করা মহাপাপ। ভীত, অনন্যগতি, দুর্ব্বল ও শরণাগত ব্যক্তিগণকে আমি সর্ব্বদা প্রাণপণে রক্ষা করিয়া থাকি। অতএব আত্মসুখের জন্য ও স্বর্গভোগের আশায়, আমি এই আশ্রিত প্রাণীকে পরিত্যাগ করিয়া মহাপাপ করিতে পারি না। অমররাজ! আমার বিবেচনায়, আশ্রিত জনকে পরিত্যাগ, শরণাগত ব্যক্তিকে ভয়প্রদর্শন, স্ত্রীহত্যা, পরস্বাপহরণ এবং মিত্রদ্রোহ, এই কয়েকটি কার্য্যই মহাপাপ। অতএব অমররাজ! আপনি আমাকে বৃথা অনুরোধ করিবেন না। কুক্কুরের জন্য যদি আমাকে নরকভোগ করিতে হয়, তাহাও আমি শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করি; কিন্তু ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গসুখেও আমার বাসনা নাই।"

ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরের এইরূপ দৃঢ়তা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ ভাব ও আশ্রিত জনের প্রতি প্রেমের পরিচয় পাইয়া, স্বয়ং ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রকাশিত হইয়া মধুর বচনে তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস! তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি এই কুক্কুর রূপে তোমার সঙ্গে আসিয়াছিলাম। পূর্ব্বে দ্বৈতবনে আমি তোমাকে একবার পরীক্ষা করিয়াছিলাম। স্মরণ আছে কি, তোমার ভ্রাতৃগণ জল অন্বেষণার্থে গমন করিয়া জীবন হারাইলে, তুমি সহোদর ভীম ও অর্জ্জুনের জীবন প্রার্থনা না করিয়া, নকুলের জীবনই প্রার্থনা করিয়াছিলে। এখনও এই কুক্কুরকে আশ্রিত জ্ঞান করিয়া স্বর্গসুখ পরিত্যাগ করিতেও বিমুখ হইলে না। আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিয়া যাহারা এইরূপে অপরের সুখান্বেষণ করে, আপনার সম্পদ বিপদের দিকে দৃষ্টি না

করিয়া যাহারা বিপন্ন ও অসহায়কে আশ্রয় দিয়া থাকে, তাহারাই যথার্থ ধর্ম্মপুত্র,—তাহারাই স্বর্গলোকের অধিকারী। অতএব এস বৎস! স্বর্গে গমন করিয়া অমরবৃন্দের সহিত মিলিত হও, এবং যে স্বর্গীয় অমৃত পান করিয়া দেবগণ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহা পান করিয়া কৃতার্থ হও।”

মহাজনেরা কোন অবস্থাতেই আশ্রিত জনকে পরিত্যাগ করেন না।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

ইংরাজি শিক্ষা আমাদিগের দেশে প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এই একটি মহদুপকার সাধিত হইয়াছে যে, আমরা বিশ্বের তাবৎ দেশগুলির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। পাশ্চাত্য জাতিগণ পৃথিবীর নানাস্থান আবিষ্কার করিয়াছেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিশ্বের সকল কথা আমাদিগকে অবগত করাইতেছে। নদী, গিরি ও সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া ইঁহারা দেশ-দেশান্তরের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করিতেছেন। সুতরাং ইংরাজি শিক্ষার সাহায্যে আমরা পশ্চিম দেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা পূর্ব্বক সকল মনুষ্য-জাতির পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি।

রাজা রামমোহন রায়।

যে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া আমরা এতদূর কল্যাণ লাভ করিয়াছি, সেই শিক্ষার প্রচলন জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা যে চিরকৃতজ্ঞ, সে কথা কি আর বলিবার প্রয়োজন আছে? এই দেশবাসিগণকে শিক্ষাদান সম্বন্ধে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সবিশেষ আগ্রহ ছিল এবং ডেভিড্ হেয়ার, লর্ড মেকলে প্রভৃতি মহাত্মাগণ এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ন্যায় এতদ্দেশীয় আর একজন মহাত্মার নিকটেও আমরা কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ, তিনি স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়।

রামমোহন রায় ভারতবর্ষের প্রাচীন বেদ উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবে কিনা, এ সম্বন্ধে যখন বাদানুবাদ ও বিচার চলিতেছিল এবং অনেকেই ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন রামমোহন রায় তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টকে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী শিক্ষার পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক এক পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি অতি সুস্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, কেবল সংস্কৃত ও পারসি শিক্ষায় এ দেশীয় লোকের উপকার হইবে না, ইংরাজী শিক্ষা ব্যতীত এদেশের উন্নতির সম্ভাবনা অল্প। অবশেষে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মহামতি লর্ড উইলিয়াম্ বেণ্টিঙ্কের শাসন সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষাবলম্বিগণের জয় হইল।

হুগলী জিলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী

রাধানগর গ্রামে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায় ও মাতার নাম তারিণী দেবী। তারিণী দেবীর প্রচলিত নাম ফুলঠাকুরাণী ছিল। রামমোহন রায়ের বংশ সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণব এবং কুলীন বংশ ছিল। নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া তাঁহার প্রপিতামহ "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রামমোহন রায়ের জন্মকালে এ দেশের অবস্থা সকল দিকেই অতীব শোচনীয় ছিল। ইংরাজ-শাসন তাহার অল্পকাল পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল, সুতরাং দেশ সুশাসিত ছিল না। যে বৎসর রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন, সেই বৎসরেই ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হয়েন ও প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়।

তৎকালে গুরু মহাশয়ের পাঠশালা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী, এবং মৌলবিদিগের নিকট পারসি ও আরবি ভাষা শিক্ষার স্থান, এই তিন প্রকার শিক্ষালয় ছিল। রামমোহন রায় অতি অল্প বয়সেই পাঠারম্ভ করিয়া পাটনায় গমন ও অবস্থিতি পূর্ব্বক তথায় আরবি ভাষা শিক্ষা করেন। কোরাণ গ্রন্থ পাঠে একেশ্বরবাদের ভাব তাঁহার অন্তরে প্রবলভাবে প্রবিষ্ট হইল। পাটনা হইতে দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি কাশীধামে গমন করিলেন। স্বাভাবিক প্রতিভাবলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাশীতে তিনি বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন।

রামমোহন রায় ইংলণ্ডে বাসকালে তাঁহার জনৈক ইংরাজ

বন্ধুকে একখানি পত্রে আত্মজীবনচরিত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেই পত্রে এইরূপ প্রকাশ যে, তাঁহার ধর্ম্মমতের জন্য তিনি পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার ষোড়শ বৎসর বয়স ছিল। সেই বয়সে তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া তত্রত্য ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিলেন। অবশেষে হিমালয় লঙ্ঘন পূর্ব্বক সেই অপূর্ব্ব সাহসী বালক তিব্বতে গমন করিলেন। বোধহয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম অনুসন্ধান মানসে তিনি তিব্বত যাইয়া থাকিবেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তখন ইংরাজ শাসন ভালরূপে প্রবর্ত্তিত হয় নাই, সর্ব্বত্র দস্যু তস্করের ভীতি, যাতায়াতের কোন সুবিধা ছিল না এবং এক জিলা হইতে অন্য জিলায় গমন করাই এক ভাবনার ব্যাপার ছিল। সেই সময়ে উত্তুঙ্গ হিমগিরি লঙ্ঘন করা একজন ষোড়শ বর্ষীয় বালকের পক্ষে অসাধারণ কাণ্ড বলিতেই হইবে! দুর্গম ভয়সঙ্কুল পার্ব্বত্য তুষার-পথ অতিক্রম করা এক্ষণেও আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইবে।

যাহা হউক, রামমোহন তিব্বত হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার পিতা রামমোহনের সংবাদ না পাইয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া নানাস্থানে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যাগত হইলে তাঁহার পিতা মাতা উভয়েই আনন্দিত হইলেন।

সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চ্চায় তাঁহার আলস্য ছিল না। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ব্যাকরণ সমস্তই তিনি একে একে অধ্যয়ন করিয়া সমাপ্ত করিলেন। হিন্দুশাস্ত্র-সমুদ্রের মধ্যে যতই তিনি গভীরতর—

গভীরতম—প্রদেশে নিমগ্ন হইলেন, ততই প্রাচীন ঋষিগণের ব্রহ্মজ্ঞানের মাহাত্ম্য দর্শনে তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইলেন।

পাঠে রামমোহন এরূপ অনুরাগী ছিলেন যে, প্রাতঃকালে অধ্যয়নে উপবেশন করিলে অনেক সময় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইত, তিনি জানিতেই পারিতেন না। তাঁহার মাতা ফুলঠাকুরাণী ভিন্ন পাঠাগারে তাঁহার তপোবিঘ্ন করিতে অপর কেহই সাহসী হইতেন না।

দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রামমোহন রায় ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাদৃশ মনোযোগ পূর্ব্বক ঐ ভাষা তিনি অধ্যয়ন করেন নাই, তজ্জন্য বিশেষ অগ্রসর হইতেও সমর্থ হইলেন না। রংপুরের কালেক্টর ডিগ্‌বি সাহেবের অধীনে ইহার পাঁচ কিংবা ছয় বৎসর পরে তিনি কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার প্রতি সাহেব শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শীঘ্রই তাঁহাকে দেওয়ানি পদে অধিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। ডিগ্‌বি সাহেবের সহিত রামমোহন রায়ের সবিশেষ বন্ধুতা হইল। এই সময়ে ইংরাজি ভাষায় তিনি অধিকার লাভ করিলেন এবং ডিগ্‌বি সাহেবের সম্পাদকতায় ইংরাজীতে বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য ও কেনোপনিষদ্ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন। ত্রয়োদশ বর্ষকাল রামমোহন গবর্ণমেণ্টের চাকুরি করিয়াছিলেন। বুদ্ধি, সচ্চরিত্রতা, কর্ম্মপটুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের নিমিত্ত তিনি সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জনও করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অধ্যয়নশীলতা

কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। বরং ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া তিনি ইংরাজী, পারসি ও আরবি ভাষায় বেদান্ত গ্রন্থ সকলের অনুবাদ ও তাহার সারমর্ম্ম প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, প্রতিভা, গভীর জ্ঞান ও চরিত্রে বহুলোক তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। ৺ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পিতামহ স্বর্গীয় গোপীমোহন ঠাকুর, স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার সহায় ও বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মহত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অজ্ঞতাবশতঃ বহুলোক তাঁহার শত্রুও হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মত্যাগের পর কিছুকাল মুরসিদাবাদে বাস করিয়া ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিলেন এবং মাণিকতলায় একটী বাটী ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার পরবৎসর বাঙ্গালা ভাষায় তিনি বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় গদ্য রচনা ছিল না বলিলেই হয়। রামমোহন রায়ই বাঙ্গালা গদ্যের পিতা।

তৎপরে রামমোহন রায় বিশেষ ভাবে খৃষ্টধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাইবেল গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি গ্রীক্ ভাষা শিক্ষা করিয়া নূতন বাইবেলের মূলগ্রন্থ পাঠ করিলেন। ছয় মাসের মধ্যে তিনি

হিব্রুর ন্যায় দুরূহ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাইবেল পাঠ করিয়া মহাপুরুষ খৃষ্ট ও তাঁহার ধর্ম্মমতের উপর রামমোহনের প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ হইল।

রামমোহন ইহার পর যখন ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন তখন তত্রত্য বহুলোক তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মে অনুরাগ দর্শন করিয়া তাঁহাকে খৃষ্টান ভাবিয়াছিলেন। আবার মুসলমানগণ তাঁহাকে মৌলবী রামমোহন রায় এবং "জবর দস্ত" মৌলবী বলিতেন। জগতের সকল বড় বড় ধর্ম্মের সার সত্য সকল গ্রহণ করিয়া রামমোহন আমাদিগকে তাহা দান করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বদেশের মানবের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি, শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছায় ও রামমোহন রায়ের সবিশেষ চেষ্টায় ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথার নিবারণ হয়। রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে সহৃদয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ দেশীয় লোকের ধর্ম্মমত ও সামাজিক রীতি নীতির উপর হস্তক্ষেপ করা গবর্ণমেণ্টের আদর্শ-বিরুদ্ধ হওয়াতে এ সম্বন্ধে হঠাৎ কোন নিষেধ প্রচার করিতে গবর্ণমেণ্ট ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের সহিত গবর্ণমেণ্ট আলোচনা করিতেছিলেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লীর শাসনকালের শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ

পর্য্যন্ত, এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কোন নিষেধসূচক নিয়ম প্রস্তুত করেন নাই। সতীদাহ সম্বন্ধে যে সকল প্রতিবেদন (রিপোর্ট) গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে প্রায় ছয়শত বিধবা প্রতি বৎসর সহমৃতা হইতেন এরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামমোহন রায় বাল্যকালে একবার এক সহমরণ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া সেই বয়সেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এই কুপ্রথা দূর করিবার নিমিত্ত তিনি আজীবন চেষ্টা করিবেন। এক বিধবা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার আর্ত্তনাদ যাহাতে কাহারও কর্ণগোচর না হয় তজ্জন্য প্রকাশ্যভাবে বাদ্য ধ্বনিত হইতেছে, চিতা হইতে গাত্রোত্থানের উপক্রম করিবামাত্র তাঁহার স্বজনবর্গ তাঁহাকে বংশখণ্ড দ্বারা চাপিয়া রাখিতেছে! এরূপ লোমহর্ষণ কাণ্ড দেখিয়া রামমোহন রায় যে অত্যন্ত গভীরভাবে বিচলিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি!

স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, এরূপ বিধবা রমণী যে তৎকালে ছিলেন না, তাহা নহে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক সত্বঃ বিধবাদিগকে দাহ করা হইত। রামমোহন রায় ১৮১৮ সালে সতীদাহ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। সহমরণ সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছিলেন। সেই সকল পুস্তক তিনি বিনামূল্যে দেশের সর্ব্বত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক তিনি মারকুইস অব হেষ্টিংসের সহধর্ম্মিণীর নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এরূপ

শুনা যায় যে, কখনও কখনও কলিকাতার গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া রামমোহন সহমরণ নিবারণের চেষ্টা করিতেন। সতীদাহ সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তক প্রকাশিত হইলে গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহামতি লর্ড বেণ্টিঙ্ক রামমোহন রায়ের সহিত আলোচনা করিয়া এই ভীষণ প্রথা উঠাইয়া দিলেন। লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের সহৃদয়তা ও রামমোহন রায়ের প্রাণগত পরিশ্রম ইতিহাস চিরদিনই কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য রামমোহন রায় এক সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা রামমোহন রায়ের যত্নে কিরূপে এই দেশে প্রচলিত হইল প্রবন্ধারম্ভে তাহা উক্ত হইয়াছে। এস্থলে কেবল এইটুকু বলা আবশ্যক যে, রামমোহন ও তাঁহার বন্ধু ডেভিড্ হেয়ার ও সার্ এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট এই তিন জনের যত্নে, প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয়, হিন্দু-কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন উদ্দেশ্যে রামমোহন রায় অর্থব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ডফ্ সাহেব যখন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন রামমোহন রায় তাঁহাকে মাসিক অর্থ সাহায্য করিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিজের একটি ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্য যে তাঁহার নিকট কতদূর ঋণী তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। রামমোহন রায় "সংবাদ-কৌমুদী" নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে ধর্ম্মনীতি,

বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় সকলের আলোচনা থাকিত। এতদ্ভিন্ন একখানি পারস্য পত্রিকাও তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন, এরূপ শ্রুত হওয়া যায়।

বহুকাল হইতেই রামমোহন রায়ের ইংলণ্ডে গমন করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। অবশেষে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সেই বহুকালের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। দিল্লীর সম্রাট্‌কে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে তিনি রামমোহনকে তাঁহার হইয়া আবেদন করিবার নিমিত্ত ভারার্পণ করেন। দিল্লীর সম্রাটের নিকট তিনি "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। বস্তুতঃ বাদশাহের সাহায্যেই তাঁহার ইংলণ্ড গমনের সুযোগ হইল।

রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড গমনের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে অনেকেই তাঁহার নাম জ্ঞাত ছিলেন। ইংলণ্ডের অনেক পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে লেখা বাহির হইয়াছিল। তাঁহার ইংরাজী বেদান্ত ও অন্যান্য রচনা পণ্ডিতসমাজে পরিচিত ছিল। রামমোহন তাঁহার পালিতপুত্র রাজারাম ও অন্য দুইজন ভারতবাসী সমভিব্যাহারে সমুদ্র-যাত্রা করিলেন। জাহাজে অধিকাংশ সময়েই তিনি অধ্যয়ন করিতেন। সর্ব্বদা তাঁহার প্রফুল্ল মুখ ও উৎসাহবর্দ্ধক আলোচনা শুনিয়া জাহাজের সকল লোকেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রায় চারি মাস ত্রয়োবিংশ দিবস অন্তে জাহাজ লিভারপুল বন্দরে পৌঁছিল।

আফ্রিকা ঘুরিয়া যাইতে হইত বলিয়া ইংলণ্ডে যাইতে তখন এরূপ সুদীর্ঘ সময় লাগিত। লিভারপুলে অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পুরুষ ও মহিলা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। লিভারপুল হইতে লণ্ডনে পৌঁছিবামাত্র সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ দার্শনিক জেরেমি বেন্‌থাম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও মধুর প্রকৃতি দেখিয়া প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। প্রতিদিন বহু সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে আরম্ভ করিলেন। ইংলণ্ডাধিপতি স্বয়ং তাঁহার প্রতি অনুগ্রহপ্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন।

রামমোহন রায়ের সম্মানার্থ লণ্ডনে প্রকাশ্য সভা হইয়াছিল ও তাহাতে তাঁহার ইংরাজ বন্ধুগণ তাঁহার প্রতিভা, জীবনচরিত ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া রামমোহন রায় ফ্রান্সে গমন করেন। ফরাসী রাজা লুই ফিলিপ্ তাঁহাকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিয়াছিলেন। ফরাসীদেশেও এইরূপে তিনি যথেষ্ট সম্মান লাভ করিলেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিছুকাল লণ্ডনে অবস্থিতি করিয়া অবশেষে রামমোহন ব্রিষ্টলে গমন করিলেন। তথায় জ্বরাক্রান্ত হইয়া জ্বর-বিকারে ২৭এ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এই মহাপুরুষ প্রাণত্যাগ করিলেন।

সংসারে একই ব্যক্তিতে কর্ম্মশীলতা ও ধর্ম্মানুরাগ, পাণ্ডিত্য ও ভক্তিপ্রবণতা অতি অল্প সময়েই দৃষ্ট হইয়া থাকে। রামমোহন রায়ের জীবনে আমরা মানবচরিত্রের সকল দিকের অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। তিনি তজ্জন্য আধুনিক ভারতবর্ষের গৌরবস্থল।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠা।

যাহা করিবার যোগ্য অথবা যাহা করা বিধেয় তাহাকেই কর্ত্তব্য কহে। কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে নিষ্ঠা মানবের চরিত্রগঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই নিষ্ঠার অভাবে বহু সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিও সংসারে পদে পদেই অকৃতার্থ ও অকৃতকার্য্য হইতে বাধ্য হয়। কারণ, যাহা অবশ্যকরণীয় তাহা সম্পন্ন করিতে না পারিলে, মানব জীবনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে কেহ সমর্থ হয় না। সে হয়ত নানা কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে, কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অভাবে কোন কর্ম্মই তাহার দ্বারা সুসিদ্ধ হয় না।

এতদ্ব্যতীত কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অভাব থাকিলে আর একটি বিশেষ ক্ষতি হয় এই যে, কর্ত্তব্যনিষ্ঠাবিহীন ব্যক্তি কাহারও শ্রদ্ধা বা আস্থা লাভ করে না। কেহ তাহাকে কোন কর্ম্মের ভার অর্পণ করিতে সাহস পায় না কিংবা ভার অর্পণ করিলে সেই কর্ম্মের সিদ্ধি সম্বন্ধে তাহার মন কখনই নিশ্চিন্ত ও

নিরুদ্বিগ্ন থাকে না। সর্ব্বদাই তাহার মনে এই আশঙ্কা জাগরূক থাকে যে, অমুক ব্যক্তিকে যে কর্ম্মের ভার প্রদত্ত হইয়াছে, সে কর্ম্ম কদাচ সুসম্পন্ন হইবে না। ভাবিয়া দেখ, এই একটি গুণের অভাবে লোকসমাজে সেই ব্যক্তির কিরূপ লাঞ্ছনা! তাহার হয়ত বিদ্যাবুদ্ধি অপর দশজনের অপেক্ষা অধিক, তাহার চরিত্রে হয়ত ঔদার্য্য ও মহত্ব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান, কিন্তু একটি গুণ না থাকায়, তাহার সমস্ত জীবন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যায়। দুগ্ধে এক বিন্দু অম্লরস সংযুক্ত হইলে যেরূপ সমস্ত দুগ্ধই নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ মানবের চরিত্রে যদি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা না থাকে তাহা হইলে তাহার অপরাপর সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও তাহার চরিত্র তাদৃশ শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় না।

বালক-বয়সে, বিদ্যা অর্জ্জনের কালে, যাহাতে কর্ত্তব্য পালনে কোন শৈথিল্য না ঘটে, তৎপ্রতি সকল ছাত্রের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পূর্ব্বকালে ছাত্রগণকে যখন গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইত, তখন কঠোর নিয়মে তাহাদিগের সকল অভ্যাসগুলিকে নিয়মিত করিবার জন্য তাহাদিগকে সাধনা করিতে হইত। এই নিয়মনিষ্ঠার গুণে তাহাদের চরিত্র সুগঠিত হইত এবং তাহারা ছাত্রাবস্থা অতিক্রমপূর্ব্বক গার্হস্থ্য জীবনে সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধনে কৃতকার্য্য হইত।

পূর্ব্বকালে আয়োদধৌম্য ঋষির উপমন্যু নামক এক শিষ্য

ছিলেন। প্রাচীনকালের ছাত্রগণ গুরুকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং কদাচ গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেন না। ঋষি আয়োদধৌম্য তাঁহার শিষ্যগণকে কঠোর কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদের দ্বারা নানা শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করাইয়া লইতেন। উপমন্যুকে তিনি স্বীয় গোচারণে নিযুক্ত করিলেন।

উপমন্যু প্রত্যহ প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া গাভী লইয়া প্রান্তরে যাইতেন এবং সন্ধ্যাকালে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। একদা আচার্য্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস উপমন্যু, তোমাকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি, তুমি কি আহার কর?" উপমন্যু উত্তর করিলেন, "ভগবন্, আমি ভিক্ষাদ্বারা আমার অন্ন সংগ্রহ করিয়া থাকি।" গুরু তাঁহাকে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। উপমন্যু গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অতঃপর ভিক্ষালব্ধ অন্ন গুরুর চরণেই উপস্থিত করিতেন, গুরু তাঁহার উপজীবিকার নিমিত্ত তাঁহাকে কিছু দিতেন না। এই-রূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, গুরু একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি এখন কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ কর?" উপমন্যু তদুত্তরে কহিলেন যে, তিনি প্রথম বার ভিক্ষা করিয়া যাহা সংগ্রহ করেন, তৎসমুদয় গুরুকে নিবেদন করিয়া দ্বিতীয় বার ভিক্ষা করিতে বাহির হয়েন। গুরু তাঁহাকে দ্বিতীয়বার ভিক্ষা করিতে নিষেধ করিলেন। উপমন্যু গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। পুনরায়

কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে গুরু তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, “বৎস, তুমি যখন ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন ধারণ কর না, তখন তো তোমার কৃশ হইবার কথা, তোমার শরীর কৃশ দেখিতেছি না কেন?” এই প্রশ্নের উত্তরে উপমন্যু কহিলেন যে, তিনি গাভীদুগ্ধ দোহন করিয়া পান করেন। গুরু এ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিলেন এবং কহিলেন যে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার গাভীদুগ্ধ পান করিয়া উপমন্যু চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, এই কর্ম্ম তাঁহার অনুচিত হইয়াছে।

পুনরায় কতিপয় দিবস গত হইলে, গুরু দেখিলেন যে উপমন্যুর শরীর উপবাসক্লিষ্টের ন্যায় ক্ষীণ বোধ হইতেছে না। জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিলেন যে, দুগ্ধপান কালে গোবৎস-গণের মুখের উভয় পার্শ্ব হইতে যে ফেন নির্গত হয়, তাহাই পান করিয়া উপমন্যু জীবন ধারণ করিয়াছেন। গুরু এরূপ করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং উপমন্যু গুরুর নিষেধ-বাক্য মান্য করিলেন।

এইরূপে গুরুর আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া সকল প্রকার আহার্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া উপমন্যু একদা বনে ভ্রমণ করিতে করিতে বিষম ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া তিনি সম্মুখে এক আকন্দ বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া তাহারই পত্র ভক্ষণ করিলেন। আকন্দ পত্র ভক্ষণ করিয়া তিনি অন্ধ হইয়া গেলেন এবং এক শুষ্ক কূপের মধ্যে পতিত হইলেন।

সন্ধ্যাকালে গাভীদল গোষ্ঠে প্রত্যাগত হইল, কিন্তু উপমন্যুর দর্শন নাই। আয়োদধৌম্য বনে প্রবিষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে উপমন্যুর নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। উপমন্যু কূপ হইতে উত্তর করিলেন এবং কি কারণে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা জানাইলেন। গুরু তখন তাঁহাকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করিতে বলিলেন। অশ্বিনী-কুমারগণ দেববৈদ্য, তাঁহারা উপমন্যুর আশ্চর্য্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দর্শনে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করিয়া দিলেন।

সত্যপরায়ণতা।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অভাবে মানবের চরিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, কিন্তু সত্যপরায়ণতার অভাবে চরিত্র আদৌ গঠিত হয় না। কারণ সত্যপরায়ণতা মানব-চরিত্রের ভিত্তিস্বরূপ। ভিত্তি না থাকিলে যেরূপ কোন গৃহনির্ম্মাণ সম্ভাবনীয় নহে, সেইরূপ সত্যপরায়ণতা না থাকিলে সৎচরিত্রের অস্তিত্বই অসম্ভব হয়। এইজন্য যাঁহারা মানবগুরু, তাঁহারা বলিয়াছেন, সত্যের সমান আর ধর্ম্ম নাই, এবং আপনাদের জীবনে তাঁহারা সত্য হইতে কদাচ চুল-পরিমাণ ভ্রষ্ট হয়েন নাই।

সত্যপরায়ণতা কেবল মাত্র সত্যবাক্যকথনেই পর্য্যবসিত

নহে। সত্যবাক্য কহিয়াও মানব অসত্য আচরণ করিতে পারে। কোন প্রকার কপট আচরণের নামই অসত্য আচরণ। পণ্ডিত গ্যালিলিও যখন আলোচনা দ্বারা জ্ঞাত হইলেন যে, পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে না—তখন সেই সত্য প্রকাশ করিতে তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও পশ্চাৎপদ হইলেন না এবং সেই চিন্তা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে কারারুদ্ধ হইতে হইল। কারণ ঐ মত তাঁহার স্বদেশবাসিদিগের প্রচলিত ধর্ম্মসংস্কারের বিরোধী ছিল। এক্ষেত্রে তিনি সত্য বুঝিয়াও যদি মিথ্যাকেই আশ্রয় করিতেন, তাহা হইলে তিনি কাপট্য দোষে দোষী হইতেন সন্দেহ নাই। বাক্যে, চিন্তায়, কর্ম্মে—অসত্যকে কোথাও লেশমাত্র প্রশ্রয় দিলে অসত্যের শৃঙ্খল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াই চলে। যেহেতু একটি অসত্য অন্য একটি অসত্যের সৃষ্টি করে। এক্ষণে হজরত মোহম্মদের এক শিষ্যের অদ্ভুত সত্যপরায়ণতার কাহিনী তোমাদিগকে বলিতেছি।

বেলালের কাহিনী।

পুণ্যতীর্থ মক্কা নগরীতে বেলাল নামক এক কাফ্রী, প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী ধনী আমিয়ার ক্রীতদাস ছিল। আমিয়া তাহাকে মন্দিররক্ষকের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিল এবং সে স্বভাবতঃ শিষ্ট ও বিনয়ী ছিল বলিয়া অসংখ্য দাসদাসীর মধ্যে তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিত।

একদা কাবামন্দিরে গমন করিয়া বেলাল প্রদীপ্ত ভাস্কর-তুল্য এক দিব্যজ্যোতিবিশিষ্ট পুরুষকে সন্দর্শন করিল। তাঁহার দৃষ্টি বিদ্দ্যুন্ময়ী, ললাট উন্নত ও তেজঃপুঞ্জ, বাণী অগ্নির সমান। সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক তিনি কহিতেছেন, "সর্ব্বচরাচরে সেই এক মহান্ আল্লা বিরাজমান; তিনি ভিন্ন এ জগতের আর কেহই অধীশ্বর নহে।" মোহম্মদের জ্ঞাতি কোরেশবংশীয়গণ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে বিদ্রূপ করিয়া কেহ বা হাস্য করিতেছে, কেহ বা তাঁহার অঙ্গে ধূলিনিক্ষেপ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিতেছে।

মহাপুরুষ মোহম্মদের সেই বাণী ভৃত্য বেলালের চিত্তকে চঞ্চল করিল। যে মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল যে, মোহম্মদ যাহা কহিতেছেন তাহাই সত্য, সেই মুহূর্ত্তে সে হ্জরত মোহম্মদের নিকট আগমন করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল। তাহার প্রভুর কর্ণে এই বার্ত্তা পৌঁছিবামাত্র তিনি ক্রোধে অগ্নির মত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং বেলালকে তাহার কর্ম্মের সমুচিত দণ্ড বিধানের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইলেন। মধ্যাহ্ণে মার্ত্তণ্ডতাপে যখন মক্কার বালুকাময় প্রান্তর হুতাশনের ন্যায় উত্তপ্ত হইয়াছে, তখন নিষ্ঠুর আমিয়া বেলালকে উলঙ্গ করিয়া এবং তাহার হস্তপদ দৃঢ়রূপে রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া তপ্ত বালুকার উপরে তাহাকে শয়ান করাইল। বেলালের সর্ব্বাঙ্গ সেই তীব্র উত্তাপের জ্বালায় দগ্ধপ্রায় হইল, তথাপি তাহার প্রভু তাহাকে সত্য ব্রত হইতে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হইল না।

আমিয়া তাহাকে কণ্টকপুঞ্জের উপরে নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহার দেহ হইতে রুধির-ধারা প্রবাহিত করাইল, তথাপি তাহার ব্রত ভঙ্গ হইল না।

হজরত মোহম্মদের প্রধান শিষ্য আবুবেকরের চক্ষে একদা বেলালের নির্য্যাতনদৃশ্য পতিত হইল। তিনি দেখিলেন, বেলালের গলদেশ উষ্ট্র-রোমে আবদ্ধ করিয়া আমিয়ার ভৃত্যবর্গ তাহাকে পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার গলদেশ রুধিরাক্ত, চক্ষুতারকা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত, চীৎকার করিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত তাহার নাই। আবুবেকরের দয়ার্দ্র চিত্ত বেলালের দুঃখে বিগলিত হইল। তিনি বহু স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা বেলালকে তাহার নিষ্ঠুর প্রভুর কবল হইতে উদ্ধার করিলেন। চতুর আমিয়া হাস্য করিয়া কহিল, "তুমি মূর্খ, সেই হেতু এই তুচ্ছ ভৃত্যের মূল্য নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া আমাকে এত গুলি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া ঠকিলে!" ভক্তশ্রেষ্ঠ আবুবেকর বেলালকে বক্ষে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন, "হে আমিয়া! আমার প্রভু যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ রত্নস্বরূপ জ্ঞান করেন, তাঁহাকে তুচ্ছ পার্থিব ধনের বিনিময়ে লাভ করিয়া আমি যে আমার প্রভুর অমূল্য প্রসাদের অধিকারী হইলাম! যে জন যথার্থ সত্যনিষ্ঠ ভক্ত, পৃথিবীর সকল মণিমাণিক্যের অপেক্ষা তাহার মূল্য যে আল্লার নিকট অধিক। সেই শ্রেষ্ঠ ধনের মূল্য তুমি বুঝ নাই, আমি বুঝিয়াছি। সুতরাং তুমি ঠকিলে কি আমি ঠকিলাম, তাহার বিচার কে করিবে?"

আবুবেকর মহোল্লাসে বেলালকে মোহম্মদের কাছে লইয়া গেলেন। হজরত মোহম্মদ তাঁহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, "আমি ভক্তমুখে আজান শুনিতে ইচ্ছা করি; প্রত্যহ নমাজের সময়ে ইনি আমাদিগকে আহ্বান করিবেন।'

পৃথ্বীরাজের কথা।

সুলতান মাহমুদের কথা তোমরা শুনিয়াছ। তাঁহার পরে মহম্মদ ঘোরি নামক অপর একজন মুসলমান নৃপতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আইসেন। তৎকালে ভারতবর্ষে কনৌজের রাজা জয়চাঁদ এক প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণভাগ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের সীমা ছিল। চৌহান রাজপুতদিগের অধিপতি পৃথ্বীরাজ যদি জয়চাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইতেন, তাহা হইলে জয়চাঁদ স্বচ্ছন্দে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপুত-রাজ্য করায়ত্ত করিতে সমর্থ হইতেন, সন্দেহ নাই। এই পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার কিরূপে বিবাদ ঘটিল, তাহার কাহিনী তোমাদিগকে শুনাইব।

জয়চাঁদ নানা রাজ্য জয় করিয়া বিজয়োল্লাসে অবশেষে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন, এইরূপ সংকল্প করিলেন। পূর্ব্বকালে,

যে সৌভাগ্যবান্ রাজা এই অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতেন, অপর রাজগণ তাঁহাকেই রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া মান্য করিতে বাধ্য হইতেন।

জয়চাঁদ তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হইবার জন্য দূরাদূরের সকল রাজগণকে আহ্বান করিলেন। সেই যজ্ঞে তাঁহার একমাত্র কন্যা স্বয়ম্বরা হইবেন। পৃথ্বীরাজ জয়চাঁদের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। কারণ, দিল্লীর অধীশ্বর কেন কনৌজ-রাজকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিবে?

পৃথ্বীরাজ একদা ছদ্মবেশে কনৌজ সহরে আগমন করেন। তৎকালে জয়চাঁদের কন্যাকে তিনি দর্শন করিয়া সাতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেই কন্যা এই যজ্ঞে আপন বর নির্ব্বাচিত করিবেন ইহা শ্রুত হইয়া পৃথ্বীরাজ অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, অন্যান্য রাজগণ যজ্ঞকর্ত্তাকে তাঁহাদের প্রধান রূপে স্বীকার করিতেন বলিয়া তদীয় প্রাসাদে সেইদিবস ভৃত্যদিগের ন্যায় নানা হীন কর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। পৃথ্বীরাজ ব্যতিরেকে অপর সকল রাজা সমাগত ছিলেন বটে, কিন্তু একজনও অনুপস্থিত থাকিলে অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়না বলিয়া জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের সুবর্ণপ্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া তাহাকে যজ্ঞভূমির দ্বারদেশে দ্বারপালরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে রাজপুত রাজবৃন্দের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে জয়চাঁদ প্রকাশ্য যজ্ঞসভায় অপমানিত করিলেন।

পৃথ্বীরাজের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিবামাত্র তাঁহার

প্রতিহিংসাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। জয়চাঁদকে ইহার উপযুক্ত প্রতিফল দিবার মানসে তিনি বহু বীর সর্দ্দার ও সৈন্য সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ কনৌজে যাত্রা করিলেন। দিবা দ্বিপ্রহরে কনৌজে উপস্থিত হইয়া জয়চাঁদের সৈন্যদলকে পরাভূত করিয়া যজ্ঞশালা হইতে জয়চাঁদের কন্যাকে হরণপূর্ব্বক তিনি স্বীয় রাজধানী দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন।

কনৌজ রাজের সৈন্যদল পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পঞ্চদিবস পর্য্যন্ত চৌহান সৈন্যের সহিত ভীষণ যুদ্ধে নিযুক্ত হইল। প্রতিদিবস চৌহান বীরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল; পঞ্চম-দিবসে চৌহানগণ জয়লাভ করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগত হইতে সমর্থ হইল। দিল্লীতে পৌঁছিয়া পৃথ্বীরাজের সহিত জয়চাঁদের কন্যার বিবাহ হইল।

কিন্তু চৌহান ও কনৌজরাজ যখন পরস্পর বিবাদে নিরত, তখন ঘোর-নৃপতি মহম্মদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছেন। পৃথ্বীরাজের চিরশত্রু জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করিবার উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া মহম্মদ ঘোরির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

পৃথ্বীরাজ যখন শ্রুত হইলেন যে, মহম্মদ ঘোরি হিন্দুস্থান আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে সৈন্যসামন্ত লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া কর্ণাল হইতে অনতিদূরে তিরৌরীর প্রান্তরে এক যুদ্ধে আফগানদিগকে পরাজিত করিলেন।

এই জয়লাভই পৃথ্বীরাজের সর্ব্বনাশের হেতু হইল। কারণ,

মহম্মদ ঘোরি পরাভব স্বীকার করিবার মনুষ্য ছিলেন না। তিনি পুনরায় একলক্ষ ত্রিশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষের সীমান্তপ্রদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। তখন পৃথ্বীরাজ যুদ্ধের জন্য কিঞ্চিন্মাত্রও প্রস্তুত হয়েন নাই।

পুনরায় তিরৌরীর রণক্ষেত্রে মহাসমর ঘটিল। চিতোরের রাণা সেই যুদ্ধে নিহত হইলেন; চিতোরের ত্রয়োদশ সহস্র রাজপুত বীর সেই সমরে প্রাণত্যাগ করিল। পৃথ্বীরাজ পরাজিত হইলেন এবং দিল্লী রক্ষার্থ প্রাণপণ শক্তিতে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এতদিনে জয়চাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। কিন্তু হায়, মহম্মদ ঘোরি কেবলমাত্র দিল্লীর রাজ্য জয় করিয়াই তো সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি কনৌজ রাজ্যও আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। সেই যুদ্ধে, জয়চাঁদ গঙ্গার অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া তাঁহার জঘন্য প্রতিহিংসার সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইলেন।

ন্যায়পরতা।

সত্যপরায়ণতার সহিত ন্যায়পরতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যথার্থ সত্যপরায়ণ ব্যক্তি কখনই অন্যের প্রতি অবিচার বা

অন্যায় করিতে পারেন না। কারণ অপরের প্রাপ্য তাহাকে না দিলে, সত্যকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করাই হয় না। অতএব অন্যায় বা অবিচার করার অর্থ, অন্যের সম্বন্ধে যাহা সত্য তাহা স্বীকার না করা। এই ন্যায়পরতা গুণ মানব-চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সর্ব্বত্রই পূজিত ও আদৃত হইয়া থাকেন। কারণ, সকলেই জানে যে তাঁহাদ্বারা কাহারো কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তিনি আপন স্বার্থের নিমিত্ত অন্যের ক্ষতি করিবেন না। এমন কি, প্রয়োজন হইলে নিজের অনিষ্ট সম্ভাবনা জানিয়াও অন্যের প্রতি ন্যায়বিচার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ন্যায়পরতার আনুষঙ্গিক এই সৎসাহসের জন্য মনুষ্য-সমাজে ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের এরূপ আদর। কোন ভয় বা স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা অন্যায় করিতে পারেন না।

কাজির বিচার।

সুলতান গিয়াসুদ্দিন একদা শিকার করিতে গিয়া দৈবক্রমে তাঁহার এক বিধবা প্রজার পুত্ত্রকে নিহত করেন। বিধবা শোকে অধীরা হইয়া কাজির নিকট বিচারপ্রার্থিনী হয়। সুলতান দ্বিপ্রহরে স্বীয় প্রাসাদে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে কাজি তাঁহাকে বিচারের জন্য আহ্বান করিয়া তাঁহার সমীপে এক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত মহা সঙ্কটে পতিত হইল। সুলতানের বিশ্রাম ভঙ্গ করিবার দুঃসাহস তাহার ছিল না এবং তাহার

ভয়ঙ্কর পরিণামের বিষয়ও সে অবগত ছিল। উদ্যত অশনিকে কে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে? অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে সে এক কৌশল অবলম্বন করিল। সে অসময়ে মস্‌জিদে গমনপূর্ব্বক আজান দিল। দ্বিপ্রহরে সকল পৌরজন বিশ্রামসুখে মগ্ন; অসময়ে আজানের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সকলেই ত্বরিতপদে দৌড়িয়া আসিল। সুলতানও বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন দূত বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁহার হস্তে কাজির সেই লিপিখানি সমর্পণ করিল। কাজি তাঁহাকে বিচারার্থ আহ্বান করিয়াছেন। গিয়াসুদ্দিন মস্তক নত করিয়া, পথ-প্রদর্শনপূর্ব্বক বিচারালয়ে তাঁহাকে লইয়া যাইতে দূতকে আদেশ করিলেন।

গিয়াসুদ্দিন স্বীয় বস্ত্রাভ্যন্তরে একখানি ছুরিকা গোপনে রক্ষা করিয়া কাজির বিচারালয়ে গমন করিলেন। কাজি তাঁহাকে কোনপ্রকার সম্ভাষণ না করিয়া বা উপবেশনের নিমিত্ত আসন প্রদান না করিয়া বিচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। পুত্রহীনা বিধবার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক তিনি সুলতানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অদ্য প্রভাতে আপনি শিকার করিতে গিয়া এই বিধবার পুত্রকে বধ করিয়াছেন। ইহাকে তুষ্ট করিতে পারিলে আপনি আমার বিচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন।" সুলতান বিধবাকে প্রচুর অর্থের দ্বারা তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। তখন কাজি বিচারাসন হইতে উঠিয়া সুলতানকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন ও উপবেশনের নিমিত্ত আসন দিলেন। গিয়াসুদ্দিন

বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছুরিকা বাহির করিয়া কহিলেন, "তুমি আজ যদি সুবিচার করিতে পশ্চাৎপদ হইতে, তবে এই ছুরিকা তোমার বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিতাম।" কাজিও তাঁহার সম্মুখস্থ কশাপ্রদর্শনপূর্ব্বক রাজাকে কহিলেন, "এই কশা আমি আপনার জন্যই এই স্থানে আনয়ন করিয়াছিলাম। বিচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টামাত্র করিলে এই কশা আপনার পৃষ্ঠে পতিত হইত।"

মনুষ্যজাতির প্রতি সম্মান।

আমাদের দেশে সমত্ববুদ্ধি মানবের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সমত্ববুদ্ধির অর্থ সকলের প্রতি সমভাব। সর্ব্বভূতের প্রতি সমভাব রক্ষা করা অত্যন্ত কষ্টকর, সন্দেহ নাই। তাহা না পারিলেও, সকল মনুষ্যকে মর্য্যাদা দান করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহারা মনুষ্যজাতিকে সম্মান করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারা মনুষ্যত্বের অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন। সাধারণতঃ মনুষ্যসমাজে ধনে, মানে, মর্য্যাদায়, শক্তিতে, বিদ্যায়, মনুষ্যে মনুষ্যে নানা ভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র; কেহ মানী, কেহ দীনহীন; কেহ

শক্তিমান, কেহ দুর্ব্বল; কেহ বিদ্বান, কেহ মূর্খ। এইরূপ উচ্চ নীচের ব্যবধান মনুষ্যসমাজে আছে বলিয়া উচ্চপদবিশিষ্ট মনুষ্যের পক্ষে নিম্নস্তরের মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া সম্মান করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, কোন মানী বা বিদ্বান ব্যক্তি সকল মনুষ্যকেই সমান শ্রদ্ধা ও সমাদর করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা সেই ব্যক্তিকে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের মধ্যেই গণ্য করি। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই শ্রেণীর মনুষ্য ছিলেন। তাঁহার একটি কাহিনী নিম্নে বলিতেছি।

পাইকপাড়ার রাজপরিবারের সহিত বিদ্যাসাগরের বন্ধুতা ছিল। একদিন তিনি রাজবাটী গমন করিতেছেন, এমন সময়ে রাজবাটীর নিকটবর্ত্তী একখানি মুদি-দোকান হইতে এক বৃদ্ধ বাহিরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "ঈশ্বর খুড়ো, কোথা যাইতেছ?" বৃদ্ধের কথা শুনিবামাত্র বিদ্যাসাগর গাড়ী থামাইতে আদেশ করিলেন। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বিদ্যাসাগর সেই বৃদ্ধের নিকট গমন করিলেন। বৃদ্ধ কহিল, "আমাকে চিনিতে পার নাই?" বিদ্যাসাগর কহিলেন, "রামধন খুড়ো? তোমায় চিনিতে পারিব না কেন! তুমি ভাল আছ ত?" বৃদ্ধ কহিল, "ভাল আছি, তুমি ভাল আছ ত!" বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া বৃদ্ধের সহিত এইরূপে কথোপকথন করিতে-ছিলেন, ইতিমধ্যে বৃদ্ধ স্বীয় দোকানের সম্মুখে একখানি অপরিষ্কৃত থলিয়া বিছাইয়া বিদ্যাসাগরকে তদুপরি উপবেশন

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

করিতে দিল। এই বৃদ্ধের সহিত বিদ্যাসাগরের বাল্যকালে বন্ধুতা ছিল—এতকালের পরে পুনরায় বাল্যবন্ধুর দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার বড়ই আনন্দ হইল। সেই সময়ে রাজপরিবারের কতিপয় লোক গাড়ীতে করিয়া সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সেই দোকানে মুদির সহিত একাসনে বিদ্যাসাগরকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মর্য্যাদাবোধ বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইল। সন্ধ্যাকালে যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজবাড়ীতে আগমন করিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে মুদির কথা উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি উহার নিকট কিজন্য গিয়াছিলেন ?" তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, ঐ ব্যক্তি তাঁহার বাল্যবন্ধু। এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা তো অবাক্! তথাপি তাঁহারা তাঁহাকে কহিলেন, "আপনার ন্যায় অবস্থার লোকের কি ঐরূপ ছোটলোকের সহিত সংশ্রব রক্ষা করা উচিত ?" বিদ্যাসাগর এই কথার উত্তরে কহিলেন, "আমি দরিদ্র লোকদিগের সহিত মিশিতে ভালবাসি এবং তাহারা আমার বন্ধু। ইহাতে যদি আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে আপনাদের মর্য্যাদাবোধে বাধে, তাহা হইলে আমি আপনাদের ভবনে আসিতে ইচ্ছা করি না।" বিদ্যাসাগরের এই তেজস্বী উত্তর শ্রবণ করিয়া রাজপরিবারের লোকেরা বিশেষ লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন।

জীবনের সুখ।

মানবজীবনের সদ্বৃত্তিসকলের সম্যক্ পরিচালনে ও সম্পূর্ণ স্ফূরণেই প্রকৃত সুখ। সচরাচর লোকের মনে এই একটি সংস্কার প্রবল যে, স্বেচ্ছাচারী লোকেরা যেরূপ আহারে, বিহারে সর্ব্বপ্রকারে জীবনের সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে, মিতাচারী ব্যক্তিগণের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। মিতাচারী লোকের জীবনে যে কোনও সুখ আছে তাহাও এই শ্রেণীর লোকেরা কল্পনা করিতে পারে না। কিন্তু ইহা একটী ভ্রম। যাঁহারা পাশব বৃত্তিগুলি সংযত রাখিয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহারা মানসিক ও নৈতিক আদর্শানুসারে উচ্চতর ও অধিকতর পবিত্র সুখ লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের দেহ সুস্থ, মন নির্ম্মল, তাঁহাদের সুখের অভাব কি? তাঁহাদের জীবনধারণোপযোগী বস্তুরই বা অসদ্ভাব কোথায়? তাঁহারা প্রকৃতির আদরের সন্তান। তাঁহাদের মনে বিশুদ্ধ স্বর্গীয় সুখের উদয় হইবে এজন্য প্রকৃতি দেবী আপনাকে বিবিধ প্রকারে নির্ম্মল সৌন্দর্য্যে সুশোভিতা করিয়া রাখিয়াছেন। সান্ধ্য আকাশের প্রশান্তমূর্ত্তি, প্রভাতের সুস্নিগ্ধ সমীরণ, রবির তেজোময় জ্যোতিঃ, বিহঙ্গের সুললিত, হৃদয়োন্মাদক সঙ্গীত, এ সকলে কি জীবনের সুখ হয় না? এ সকলে কি হৃদয় মনের তৃপ্তিসাধন হয় না? বৃক্ষলতাদির কমনীয় কান্তি দর্শন করিয়া, মনোহর পুষ্পের

অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি উপভোগ করিয়া হৃদয়ের যে সুখ ও আনন্দ লাভ হয়, বহুমূল্য বিলাসের সামগ্রী উপভোগ করিয়াও তাহা হইতে পারে না। মানবের চিত্তরঞ্জনের জন্য প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডারে অসংখ্য বস্তু সম্মিলিত রহিয়াছে। যাহারা সংসারের নীচ ভাব লইয়া, সামান্য পদার্থ লইয়াই, সন্তুষ্ট থাকিতে চায়, তাহারা আপনাদের দোষেই জীবনের অতি পবিত্র সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে; তাহারা ইচ্ছা করিয়াই প্রকৃতির পরম রমণীয় শোভা নিরীক্ষণ না করিয়া অন্ধের ন্যায় কালযাপন করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, নরনারীর সুঠাম রূপ, সুমধুর গীত বাদ্য, চিত্তহারিণী কবিতা, সাধুর মধুময় সহবাস, শিশুর সুমিষ্ট হাসি, এ সকলই আমাদের সুখ ও আনন্দের জন্য। কিন্তু আবিল সলিলে যেমন চন্দ্রমার জ্যোৎস্নারাশি বিভাসিত হয় না, মলিন, ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর হৃদয় লইয়াও তেমনি কেহ কখনও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া চিত্ত বিনোদন করিতে সমর্থ হয় না।

সকলের অন্তরেই চিত্ত-রঞ্জিনী বৃত্তি আছে বটে, কিন্তু হিংসা ও পরনিন্দা, কুচিন্তা ও কদাচার, অহঙ্কার ও দম্ভ, স্বার্থপরতা ও সুখাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মলতা ও নিঃস্বার্থতা লাভ করিতে না পারিলে এই বৃত্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ হয় না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সুখী হইতে হইলে একদিকে যেমন সরল ও নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক, অপরদিকে তেমনি আত্মসুখ খর্ব্ব করিয়া অপরের সুখের জন্য কার্য্য করা প্রয়োজন। কেবল

'কই সুখ,' 'কোথায় সুখ' বলিয়া ক্রন্দন করিয়া বেড়াইলে চিরকাল যাতনাই জীবনের সার হইবে।

অশোক।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মৌর্য্যবংশ বিখ্যাত। এই বংশেই মহাবল পরাক্রমশালী নরপতি চন্দ্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্গার তীরবর্ত্তী পাটলিপুত্র নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। এক্ষণে সেই নগর পাটনা নামে অভিহিত হয়। তৎকালে এই স্থান প্রভূত সমৃদ্ধিশালী ও ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান ছিল।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত অতিশয় সমরনিপুণ ছিলেন। মহাবীর সেকেন্দারের সেনাপতি সেলিউকস্ যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন চন্দ্রগুপ্তের নিকট তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। এই বিন্দুসারের পুত্রের নামই অশোক।

অশোক সম্বন্ধে নানা কাহিনী ইতিহাসে প্রচলিত আছে। এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, তিনি অতিশয় কুরূপ ছিলেন, কিন্তু যৌবনেই তাঁহার বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকুশলতা দ্বারা তিনি সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে, বিন্দুসারের যখন অন্তিমকাল উপস্থিত হইল, তখন তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সুসীম তক্ষশিলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সুতরাং মন্ত্রিগণের পরামর্শে সুসীমের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অশোককে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া মহারাজ বিন্দুসার পরলোক গমন করিলেন।

রাজা হইয়া অশোক তদীয় ভ্রাতা সুসীমকে নিহত করেন এবং বহু রাজবংশীয় আত্মীয়গণকেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। যতদিন পর্য্যন্ত তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি "চণ্ডাশোক" নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার অত্যাচার উৎপীড়ন এবং নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য তাঁহার প্রজাবর্গ সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর তিনি "ধর্ম্মাশোক" হইয়া সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের দ্বারা মনুষ্যের যে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, বোধহয় ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই অশোকের পূর্ব্ব জীবন সম্বন্ধে নানা নিষ্ঠুর কাহিনী সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। এ সকল কাহিনীর যে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

খৃষ্টাব্দের ২৬৭ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অশোক তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলেন। মহাপুরুষ বুদ্ধদেব যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র লুম্বিনীর উদ্যান; যে স্থানে তিনি বাল্যকাল ও প্রথম যৌবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই রাজধানী কপিলবস্তু নগর; সংসার পরিত্যাগের সময় যে স্থানে তিনি

রাজবেশ ও অলঙ্কারাদি অনুচরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন সেই অনোমা নদীর কূল ; তৎপরে রাজগিরি, যেস্থানে নির্জ্জন পর্ব্বতকন্দরে অনেক যোগী তপস্যা করিতেন এবং তাঁহাদের সহবাসে সিদ্ধার্থ কিয়ৎকাল যাপন করিয়াছিলেন,—সেই সমস্ত পুণ্যতীর্থে মহারাজ অশোক ভ্রমণ করিলেন। সেই উরু-বিল্ব গ্রাম ও নৈরঞ্জনা নদীর কূল, যেস্থানে তিনি কঠোর যোগ-সাধনে রত ছিলেন এবং যেস্থানে কৃচ্ছ্র তপস্যাকে নিষ্ফল জানিয়া তিনি সুজাতার অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যে বোধিদ্রুমতলে তিনি মুক্তির পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন, বুদ্ধ গয়ার সেই বোধিদ্রুম ; যে স্থানে প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করিলেন সেই কাশীর মৃগদাব বিহার ; এবং কুশী নগর, যেস্থানে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন—মহারাজ অশোক ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত এই সমস্ত বৌদ্ধ তীর্থগুলিই দর্শন করিয়া প্রত্যেক স্থানে স্তূপাদি নির্ম্মিত করাইলেন। অদ্যাপি এই সকল স্থানে তাঁহার কীর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়।

তৎপরে তিনি দেশে বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থে ভারতবর্ষের নানা স্থানে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে নানা স্থানে দলে দলে প্রচারক প্রেরণ করিলেন। সুদূর গ্রীস, সিরিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে অশোকের ধর্ম্মপ্রচারকগণ গমন করিয়াছিলেন।

অশোকের পিতামহ এবং পিতা রণ-পরাক্রমের দ্বারা প্রায় ভারতবর্ষের তাবৎ দেশসমূহের অধিপতি হইয়াছিলেন। অশোক কলিঙ্গ অর্থাৎ উড়িষ্যাদেশ যুদ্ধের দ্বারা জয় করিয়াছিলেন।
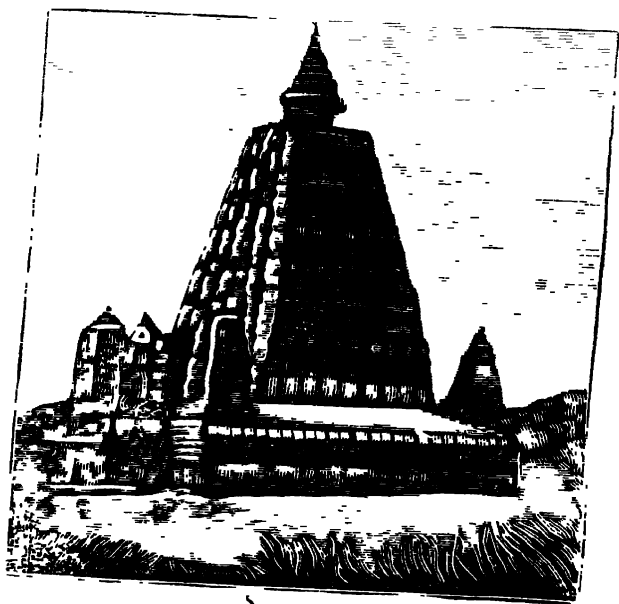
বৌদ্ধ স্তূপ

ধর্ম্মের অনুশাসন প্রচারার্থে তিনি ভারতের নানা স্থানে পর্ব্বত-গাত্রে এবং প্রস্তরস্তম্ভে তদীয় অনুশাসন খোদিত করিয়াছিলেন। তাহারই একটি অনুশাসনে দেখিতে পাই যে, কলিঙ্গ বিজয়ের জন্য যে লোকক্ষয় হইয়াছে ও লোকনিধনের জন্য নিষ্ঠুরতা প্রকটিত হইয়াছে, তজ্জন্য "দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী" রাজা অশোক অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন। অশোক স্বীয় নামের পূর্ব্বে 'দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী' এই বিশেষণপদ সংযুক্ত করিতে ভালবাসিতেন।

তাঁহার স্তম্ভ প্রভৃতিতে বহু অনুশাসন দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে দুই একটি বাক্যের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

"দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী এই আদেশ প্রচার করিতেছেন। এ স্থানে পূজার্থে কিম্বা আমোদপ্রমোদের উদ্দেশ্যে কোনও প্রকার জীবহত্যা হইবেনা।

"দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী সর্ব্বত্রই দ্বিবিধ চিকিৎসা-পদ্ধতি স্থাপিত করিয়াছেন—মনুষ্যের জন্য চিকিৎসা এবং পশুদিগের জন্য চিকিৎসা।"

পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে মহারাজ অশোকই নরচিকিৎসালয় এবং পশুচিকিৎসালয় স্থাপিত করেন। পশুপক্ষিগণের নিমিত্ত এরূপ বিস্তৃত দাতব্য চিকিৎসালয় অদ্যাপি কোথায়ও দৃষ্ট হয় না।

ফতেপুর সিক্রি ও আগ্রা।

আগ্রা-অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশে মোগল সম্রাটগণের প্রিয় বাসভূমি অগণ্য হর্ম্ম্যশোভিত আগ্রা নগরী হইতে ফতেপুর সিক্রি কিয়দ্দূরে অবস্থিত। সম্রাট আকবর এইস্থানে একটি নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা জনশূন্য। সমুচ্চ সৌধমালা তাহার অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে।

আগ্রা হইতে ফতেপুর সিক্রি পর্য্যন্ত একটি সুদীর্ঘ বঙ্কিম রক্তবর্ণ পথ গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে ভুট্টার ক্ষেত্র। মধ্যে মধ্যে দলে দলে ময়ূরশ্রেণী দৃষ্ট হয়। ভূমি ক্রমেই উন্নত হইয়া অবশেষে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতবিশেষে গিয়া শেষ হইয়াছে, সেই পর্ব্বতের উপরে জনশূন্য নগর প্রতিষ্ঠিত। ইহার দুর্গ-প্রাকার সপ্ত মাইল ব্যাপী। কোথাও লোকাবাস না থাকায় চতুর্দ্দিকে বন জঙ্গল জন্মিয়াছে। প্রাকার অতিক্রম করিয়া প্রাসাদের সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র সুবিশাল "বুলন্দ দরওয়াজা" পথিককে সহসা চমকিত করিয়া দেয়। এই সুবিশাল দ্বার এরূপ উচ্চ যে ইহার ভিতর দিয়া বিশালকায় হস্তী অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে। ইহার কারুখচিত তোরণ ইন্দ্রধনুর ন্যায় বক্রাকার ও অতীব রমণীয়। এই মনোহর প্রাসাদ-দ্বার অতিক্রম করিয়া বিশাল প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রবেশ করিলে সর্ব্ব প্রথমে একটি শুভ্র সমাধি-মন্দির লক্ষিত

আকবর শাহ।

হয়, উহা আকবর-গুরু সেলিম চিস্তি নামক এক সাধুর সমাধি-মন্দির। সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার পর চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত সম্রাট আকবরের পুত্রসন্তান হয় নাই। কে উত্তরাধিকারী হইবে, এই দুশ্চিন্তায় আকবর পুত্র কামনায় নানা তীর্থে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। অবশেষে সিক্রি গ্রামে এক গুহাবাসী পীরের সন্ধান লাভ করিয়া তিনি তাঁহার নিকট গমন করিলেন। আকবর পুত্রলাভ করিবেন, পীর তাঁহাকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলেন। আকবরের রাজপুত-মহিষী যথাকালে একটি পুত্রসন্তানকে জন্মদান করিলেন, আকবর সাধুর নামে তাহার নামকরণ করিলেন। ইতিহাসে যিনি সম্রাট্ জাহাঙ্গীর নামে খ্যাত, সেলিম তাঁহার অন্য এক নাম ছিল। সম্রাটের কামনা সিদ্ধ হইল বলিয়া ঐ স্থানে তিনি এক সহর নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার নাম রাখিলেন ফতেপুর অর্থাৎ জয়লাভের নগর।

সেলিম চিস্তির সমাধি-মন্দির শুভ্রমর্ম্মর-নির্ম্মিত। তাহার চতুর্দ্দিকেও মর্ম্মর-গবাক্ষ, এবং প্রত্যেকটি গবাক্ষ হস্তীদন্ত-শোভিত। ভিতরে শুক্তিকা-খচিত সমাধি এবং তাহাতে বিচিত্র বর্ণের কৃত্রিম পুষ্পলতা সূক্ষ্ম প্রস্তর সংযোগে প্রস্তুত করা হইয়াছে। সমাধি-স্থান দর্শন করিলে মনে হয়, আকবর যেন একটি ভক্তি-মণ্ডিত শুভ্র সুকুমার পুষ্প গুরুর নিকট নিবেদন করিয়া দিয়াছেন! তাহার পরেই দক্ষিণে মস্‌জিদ্। সেলিম চিস্তির জীবিতাবস্থায় ইহা রচিত হইয়াছিল। মস্‌জিদ পার

হইয়া উপরের দিকে এক সোপান-শ্রেণী গিয়াছে—উপরে মিনার ও গুম্বজগুলি আকাশ স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান। সেই সোপান-শ্রেণী বাহিয়া প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিলে বহু দূর পর্য্যন্ত রৌদ্র-দগ্ধ বালুকাময় মরুভূমি দৃষ্ট হয়, ভরতপুর দুর্গের শ্বেতরেখাও নয়ন-পথে অস্পষ্টরূপে পতিত হয়! চতুর্দ্দিকে বিচিত্র সৌধের পরে সৌধ, অথচ সকলই জনশূন্য এবং পরিত্যক্ত!

সম্রাট্ আকবরের সভায় ফৈজি ও আবুল ফজ্‌ল্ নামক দুই পণ্ডিত ভ্রাতা ছিলেন। আকবর ইঁহাদিগেরই নিকট পারস্য কবিদিগের পরিচয় লাভ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ফৈজি সুকবি ছিলেন। আবুল ফজ্‌ল্ সংস্কৃত শাস্ত্রাদি যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ফতেপুর সিক্রিতে এই ভ্রাতৃদ্বয়ের ভবনও দৃষ্ট হয়।

তৎপরে আকবরের হিন্দু বেগমের মহাল। আকবরের হিন্দু-মহিষী হিন্দু প্রথানুযায়ী আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া চলিতেন এবং আকবর কদাপি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তাঁহার মহালটিতে প্রবেশ করিলেই হিন্দুভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই হিন্দু মহালের পরেই "মিরিয়াম বিবির কুঠি" অর্থাৎ আকবরের আরমাণি বেগম মিরিয়ামের আলয়। এই বেগম খৃষ্টানী ছিলেন, ইঁহার গৃহের প্রাচীরে খৃষ্টান দেশীয় চিত্র অঙ্কিত আছে। তৎকালে ইউরোপ হইতে কতিপয় পাদ্রী ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন

এবং তাঁহারা খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল সম্রাট আকবরের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। বাইবেল শ্রবণ করিয়া আকবর যুবরাজ মুরাদ্‌কে ঐ ভাষা অধ্যয়ন করিতে এবং আবুল ফজ্‌ল্‌কে ঐ গ্রন্থ অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন। সম্ভবতঃ ঐ পাদ্রিদিগের দ্বারাই মিরিয়াম্‌-গৃহে খৃষ্টদেশীয় চিত্র উপস্থাপিত হইয়া থাকিবে। এই মিরিয়াম্‌-গৃহের সম্মুখেই মর্ম্মরনির্ম্মিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ ও তাহার মধ্যে জলাশয়। জলাশয়ের অপর পারে পাঁচ মহালা ভবন; তাহার আকার অনেকটা বৌদ্ধ বিহারের ন্যায়। অতঃপর দেওয়ান-ই-খাস্‌ অর্থাৎ সম্রাটের গোপন মন্ত্রণা-গৃহ—ফতেপুর সিক্রিতে প্রধান দ্রষ্টব্য সৌধ। ইহা একটি চতুষ্কোণবিশিষ্ট ভবন, মধ্যে সুন্দর একটি স্তম্ভ এবং তাহার শীর্ষে স্তরে স্তরে প্রস্তর-পত্র সকল যেন এক বৃহৎ পদ্মের দলরাজির ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই স্তম্ভ-নিম্নে আকবরের সিংহাসন ছিল এবং তথায় প্রতি বৃহস্পতিবার রজনীতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের পরস্পরের ধর্ম্মমত লইয়া আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করিতেন এবং সম্রাট নিবিষ্ট মনে তাহা শ্রবণ করিতেন। খৃষ্টান পাদ্রিগণ, মুল্লাগণ, হিন্দুশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ সকলেই আকবরের সভায় সমাগত ও সমাদৃত হইতেন।

ফতেপুর সিক্রির এই মহতী কীর্ত্তি আকবরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পরিত্যক্ত হইল। বহু ব্যয়ে ও বহু যত্নে যে নগর আকবর সৃষ্টি করিলেন, তাহা তাঁহারই স্মৃতির মূক সাক্ষী মাত্র হইয়া রহিল।

ফতেপুর সিক্রি আকবরের প্রিয় বাসস্থান হইলেও আগ্রার দুর্গে তাঁহার ও অন্যান্য মোগল বাদ্‌শাহের অনেক স্মৃতি-চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। আকবর, জাহাঙ্গীর, সাহজাহান ও ঔরঙ্গজেব—সকলেই আগ্রার প্রাসাদ-দুর্গে বাস করিয়াছিলেন। এই প্রাসাদ-দুর্গ আগ্রার রেলওয়ে ষ্টেশনের গাত্রসংলগ্ন। হস্তী-প্রবেশ করণোপযোগী ভীমকায় সিংহদ্বার অতিক্রম করিলেই নহবৎখানা দৃষ্টিগোচর হয়। নহবৎখানার পরে প্রাসাদ-মধ্যে বেগম মহালগুলি বিচিত্র সৌন্দর্য্যে পথিকের নয়ন মুগ্ধ করিয়া থাকে। জাহাঙ্গীর-মাতা আকবরের হিন্দু মহিষীর যেরূপ হিন্দু আকারের মহাল ফতেপুর সিক্রিতে দৃষ্ট হয়, আগ্রা-প্রাসাদ-দুর্গেও অবিকল সেইরূপ একটী মহাল দৃষ্ট হয়। ইহা স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে, তথাপি পুরাতন কারু-কার্য্যের পরিচয় দানের নিমিত্ত স্থানে স্থানে নানা বর্ণের প্রস্তর-খচিত পুরাতন চিত্র-কর্ম্মের যথাযথ অনুকরণ ইংরাজ সরকার বাহাদুর করাইয়া রাখিয়াছেন। নূরজাহানের মহালও কারুশিল্পে অতীব রমণীয়। তাহার অদূরে জলক্রীড়ার স্থান। এক প্রান্তে দেওয়ান-ই-খাস। দেওয়ান-ই-আম তাহার কিঞ্চিৎ দূরে।

এইস্থানে ইংরাজ-সৈনিকের বারাক হইবার পর হইতে ইহার শ্রী বিনষ্ট হইয়াছিল। সার্‌জন্ ষ্ট্রাচী মহোদয় যখন হইতে আগ্রা-অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিলেন, তখন হইতে এই প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি যত্নের

ত্রুটি করেন নাই। ইংরাজ সরকার বাহাদুর তাহার পর হইতে এই সকল সৌধ যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া ও আবশ্যক মত সংস্কার সাধন করিয়া, সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তবে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় দিল্লী ও আগ্রার অনেক শোভা বিলুপ্ত হইয়াছে।

ম্যান্‌ডেল্‌সো (Mandelso) নামক একজন পাশ্চাত্য পর্য্যটনকারী মোগল-সম্রাটদিগের শাসনকালে আগ্রা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, আগ্রায় অগণ্য সৌধ বিদ্যমান ছিল, এবং তিনি তথায় প্রায় সত্তরটি প্রকাণ্ড মস্‌জিদ দর্শন করিয়াছিলেন। মোগল সমৃদ্ধির তিনি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

আগ্রার প্রাসাদ-দুর্গে সাহজাহানের শয়নগৃহ ও বন্দীশালা সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে একদিকে বেগম মহাল, অন্যদিকে দেওয়ান-ই-খাস্ ও এক কোণে দেওয়ান-ই-আম, এবং মধ্যে জলক্রীড়ার স্থান রহিয়াছে। উপরের তলায় সাহজাহানের গৃহ। উপরে গেলে আরও কতকগুলি আশ্চর্য্য দৃশ্য পথিকের নয়ন-সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়। একটি পশু-যুদ্ধের স্থান। হস্তী প্রভৃতি পশুদিগের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখিতে মোগল-বাদ্‌শাহগণ ভালবাসিতেন। এতদ্ব্যতীত আকবরের নওরোজা বাজারেরও ভগ্নাংশ দৃষ্টিগোচর হয়। তাহা একপ্রকার সখের বাজার ছিল—ইতিহাসে সে সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সাহজাহানের গৃহে গমন

করিলে প্রাসাদপাদমূলে প্রবাহিতা যমুনা ও অদূরে তাজমহলের ধবলমূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

এইস্থানে একটি কথা বলা আবশ্যক। মোগল বাদশাহগণ আপনাদিগের নিমিত্ত বা স্বীয় মহিষীদিগের নিমিত্ত জীবিতাবস্থায় সমাধিগৃহ বহুব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইতেন। একটি উদ্যানকে প্রাচীর-বেষ্টিত করিয়া তন্মধ্যভাগে চতুষ্কোণ একটি সৌধ নির্ম্মিত হইত এবং তাহার উপরে একটি শ্বেত গুম্বজ সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল মেঘখণ্ডের ন্যায় শোভা পাইত। উদ্যান-পথের উভয়পার্শ্বে পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত হইত এবং তাহার প্রান্তভাগে সমচতুষ্কোণ উদ্যান শোভা বর্দ্ধন করিত। সমাধি-সৌধের উভয়দিকেই এই একইপ্রকার পথ, পয়ঃপ্রণালী ও উদ্যান।

সাহজাহান স্বীয় প্রিয় মহিষী মমতাজের জন্য বহুব্যয়ে জগদ্বিখ্যাত তাজমহাল নামক সমাধি-সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার ন্যায় সুন্দর হর্ম্ম্য পৃথিবীতে অল্পই আছে। ইহার চিত্র সকলেই অবলোকন করিয়াছে, তথাপি ইহা স্বচক্ষে দর্শন না করিলে ইহার মাহাত্ম্য বোধগম্য হয় না। বহুদেশ হইতে আগত শিল্পীসকল নানা মূল্যবান প্রস্তরদ্বারা এই সৌধটি গঠিত করিয়াছে। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টাভারনিয়ে ইহার নির্ম্মাণকালে আগ্রায় ছিলেন। তিনি প্রত্যহ বিংশতিসহস্র শিল্পীকে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে দেখিয়াছেন। ইহার অভ্যন্তরে একটি সুরম্য উদ্যান বিদ্যমান আছে। তাজের সৌধ অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমির উপরে দণ্ডায়মান—সোপানশ্রেণী
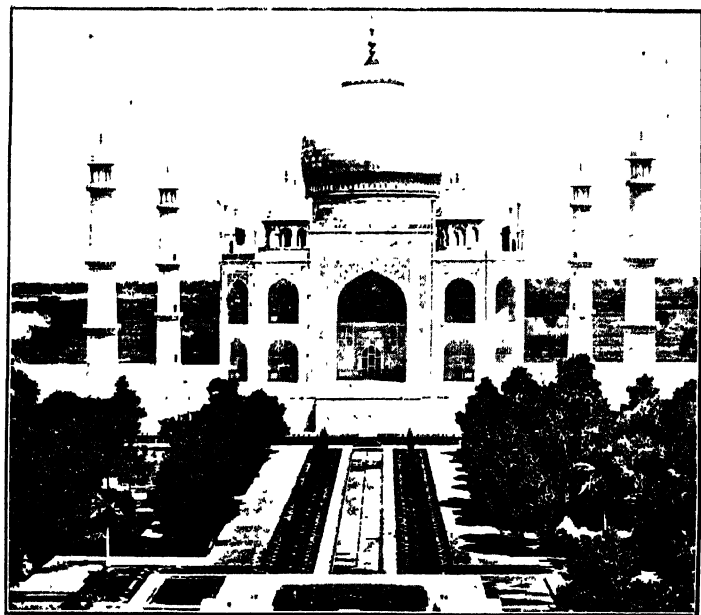
তাজমহল।

বাহিয়া তথায় যাইতে হয়। তাজের পার্শ্বদেশ ধৌত করিয়া নীল যমুনার ধারা প্রবাহিতা হইতেছে। চারি কোণে চারিটি সুন্দর শুভ্র মিনার, তারাগণ যেরূপ চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ তাজকে বেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। মধ্যভাগে ভূতলের চন্দ্রসদৃশ তাজ বিরাজমান। চতুর্দ্দিকে প্রস্তর-শিল্পের অতি সূক্ষ্ম কার্য্য—সুরঞ্জিত লতাপত্রসকল দৃশ্যমান! যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, কারু-শিল্পের অপূর্ব্ব মনোহারিত্ব তোমাকে চমৎকৃত করিবে। কিন্তু তাজের অমল ধবল গুম্বজ-গঠন এই সকল সূক্ষ্ম কারু-শোভাকে আচ্ছন্ন করিয়া একটি অপরূপ স্বপ্ন-লোকের ন্যায় সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টার মন হরণ করে। এই গুম্বজ-নিম্নে মমতাজ ও সাহজাহানের কবর সংলগ্ন ভাবে অবস্থিত। ইহার ঊর্দ্ধে বহু উচ্চে ছাদ। অতি সূক্ষ্ম মর্ম্মর গবাক্ষ-জালপথে ক্ষীণালোক প্রবেশ করিতেছে। বাহিরে ধবল মর্ম্মরের অপূর্ব্ব আলোকচ্ছটা দুই চক্ষু ঝলসিয়া দেয়, ভিতরে আলোক ক্ষীণ। কবরদ্বয়ের উপর ক্ষীণালোকের ঈষৎ আভা পতিত হইয়া তাহার বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত চিত্রলেখাবলীর প্রকাশ এরূপ রমণীয় হয় যে, তাহা মানবভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

মমতাজের মৃত্যুর প্রায় অষ্টাদশ বৎসর পরে এই সমাধি-সৌধ সমাপ্ত হয়। সাহজাহানের শেষ জীবন কারাগারে অতিবাহিত হইয়াছিল। সাহজাহানের একবার মৃত্যুর সম্ভাবনা ঘটাতে তাঁহার পুত্রগণ রাজ্যলাভের নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব সেই যুদ্ধে অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে

পরাভবপূর্ব্বক আগ্রার প্রাসাদ-দুর্গে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কারাগৃহরূপে পরিণত করিলেন। তখনও সাহজাহান জীবিত। ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখিলেন। সেই সময় হইতে মৃত্যুকালপর্য্যন্ত ঐ প্রাসাদ-দুর্গের উপরিতলে নিজগৃহে তাজের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ সম্রাট জীবনধারণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই গৃহ বিদ্যমান আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ইংরাজ রাজত্বের দুইটি প্রধান হিতকার্য্য।

প্রকৃতি-রঞ্জনই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। ইংরাজ-রাজ বর্ত্তমান ভারতে যে শত শত উপায়ে এই কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তন্মধ্যে দুইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব।

পীড়িতের শুশ্রূষা সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশে পরম হিতকর কার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্মকর্ম্মের সহিতও ইহার যোগ বর্ত্তমান। ভারতে যখন বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তখন দেশের নানা অংশে চিকিৎসালয় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার পরে বৌদ্ধগণ ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হইলে, সেগুলিও একে একে ধ্বংসমুখে পতিত হয়।

বৌদ্ধদিগের পর ভারতে আবার হিন্দুদিগের পুনরুত্থান হয়। কিন্তু এই নব যুগে হিন্দুগণ আর চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। বৌদ্ধ প্রভাবের পূর্ব্বে হিন্দুগণ চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে শাস্ত্রেরই অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন; জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই মৃত-প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া শারীর-বিদ্যা শিক্ষা করিতেন, এবং মোমের পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া শিক্ষার্থিদিগকে দেহাভ্যন্তরের যন্ত্রাদির সংস্থান দেখাইতেন। কিন্তু নবযুগের হিন্দুগণ আবার পূর্ব্ববৎ চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণগণ মৃত বা রুগ্ন প্রাণিদেহ স্পর্শকে মহাপাপ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান বৈদ্যদিগের হস্তগত হইল। কিন্তু কালক্রমে ইঁহারাও এ বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। এই সুযোগে স্বল্প-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত গ্রাম্য কবিরাজগণ চিকিৎসক হইয়া দাঁড়াইলেন।

মুসলমানগণ যখন ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন দেশের চিকিৎসা-পদ্ধতির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহারা বিদেশ হইতে এক নূতন চিকিৎসা-পদ্ধতি ভারতে আনয়ন করিলেন। ইহার নাম হকিমি চিকিৎসা।

এই মুসলমান হকিমগণই ইংরাজদিগের ভারতাগমনের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত এদেশে চিকিৎসা-কার্য্য পরিচালন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু মুসলমান শাসনকালেও ঔষধ ও পথ্যাদি বিতরণ দ্বারা দরিদ্র প্রজাদিগকে রোগমুক্ত করিবার সুব্যবস্থা

ছিল না। ইংরাজদিগের আগমনের পর হইতে এই লোকহিতকর কার্য্য ক্রমে প্রসার লাভ করিয়া এক্ষণে এরূপ আকার লাভ করিয়াছে যে, তাহার বিশেষ বিবরণ শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। দরিদ্র প্রজাদিগের সুচিকিৎসার এ প্রকার সুন্দর ব্যবস্থা ভারতে কোনকালে ছিল না।

ভারত-সাম্রাজ্যের জনবহুল স্থানে ও প্রত্যেক জেলাতেই এক্ষণে এক একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। জেলার চিকিৎসালয়ের ভার সিবিল সার্জনের উপর ন্যস্ত থাকে, এবং মফঃস্বলের চিকিৎসালয়ে মেডিক্যাল কলেজ বা স্কুলে উত্তীর্ণ সুযোগ্য ভারতবাসিগণ চিকিৎসা-কার্য্য পরিচালন করেন। সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যে এই প্রকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা সহস্রাধিক হইয়াছে। প্রতি বৎসরেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। বলা বাহুল্য, এই সকল চিকিৎসালয়ের অধিকাংশেরই ব্যয়ভার সরকার বহন করেন, এবং যাহাতে আধুনিক উন্নত চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুসারে সর্ব্বত্র কার্য্য চলে তৎপ্রতি রাজপ্রতিনিধিবর্গ ও শাসনকর্ত্তৃগণের বিশেষ দৃষ্টি থাকে। রাজপ্রতিনিধি ও শাসনকর্ত্তৃগণ পরিদর্শনে বহির্গত হইলেই নিরাশ্রয় ও দরিদ্র রোগিগণ চিকিৎসালয়ে কি প্রকারে আছে এবং তাহারা উপযুক্তরূপে পরিচর্য্যাদি লাভ করিতেছে কিনা, সর্ব্বাগ্রে তাহা অনুসন্ধান করেন। গো-বীজের টীকা দিবার পদ্ধতি প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ভারতের গ্রাম-নগরগুলি বসন্ত রোগের প্রকোপে কি প্রকারে উৎসন্ন হইয়া যাইত, তাহার

বিশেষ বিবরণ প্রদান নিষ্প্রয়োজন। বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের প্রত্যেক শিশুকে যাহাতে যথাকালে গো-বীজের টীকা দেওয়া হয়, রাজকর্ম্মচারিগণ তৎপ্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। এই ব্যবস্থায় ভারতবর্ষ হইতে প্রবল বসন্ত-রোগ বহু পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে। নিরাশ্রয় ও দরিদ্র পীড়িতদিগের সুচিকিৎসার জন্য প্রতি বৎসরে প্রায় এক কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে, এবং হিসাব করিলে দেখা যায় যে, প্রতি বৎসর প্রায় দুই কোটি পঁচাত্তর লক্ষ নরনারী ও শিশু বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বসন্ত রোগ-নিবারক টীকা দিবার জন্য রাজকোষ হইতে বৎসরে প্রায় দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করা হয়।

প্রজাদিগের মধ্যে সুশিক্ষার বিস্তার করা রাজার আর একটি প্রধান কর্ত্তব্য। অশিক্ষিত মানব ও পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। আমাদের ইংরাজ-রাজা বর্ত্তমান ভারতে নানা বিদ্যা শিক্ষা দিবার সুব্যবস্থা করিয়া দেশের যে মহদুপকার সাধন করিতেছেন তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গত ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে লোকশিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট গ্রাম্য পাঠশালার প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতে উচ্চ ও নিম্ন শিক্ষাদানের জন্য প্রতি বৎসরেই এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে বহু বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা চলিতেছে। সম্প্রতি প্রায় একাদশ লক্ষ পাঠশালা ও বিদ্যালয় ভারতে বিদ্যমান এবং সেগুলিতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ ভারতীয় বালক ও যুবক শিক্ষা

লাভ করিতেছে। এই শিক্ষাদান ব্যাপারে সরকার বাহাদুর চারি কোটি মুদ্রারও অধিক ব্যয় করেন।

হিন্দু ও মুসলমানগণ কখনই স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না সত্য, কিন্তু বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালিকাগণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ভারতে পূর্ব্বে ছিল না। ইংরাজ-রাজই ধনী ও নির্দ্ধনের কন্যাদিগকে শিক্ষা দিবার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। এক্ষণে প্রায় ছয় সহস্র বিদ্যালয়ে বহু সহস্র বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত উচ্চ শিক্ষার জন্য দশটি স্ত্রী-কলেজেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

সক্রেটিস্।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসে ও ভারতবর্ষে দুই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের একের জন্মস্থান অপরের জন্মভূমি হইতে বহুদূরবর্ত্তী; কিন্তু আবির্ভাব-কালে তাঁহারা পরস্পরের সমসাময়িক। সক্রেটিস্ ও বুদ্ধ উভয়েই মানবজাতির শিক্ষক, উভয়েই মানবকে অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য স্বীয় স্বীয় ভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী এথেন্‌স্ নগরের উপকণ্ঠে খৃষ্টাব্দের ৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা সক্রেটিস্ জন্মগ্রহণ করেন। সক্রেটিসের

পিতা একজন প্রস্তরখোদক ছিলেন; প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাই তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহের উপায় ছিল। তাঁহার মাতা ধাত্রীর কর্ম্ম করিতেন। সক্রেটিস্‌ও প্রথমে পৈত্রিক ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সাংসারিক অবস্থা কখনও সচ্ছল ছিল না। সক্রেটিস্ জেণ্টিপিনাম্নী এক নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণা ও কলহপ্রিয়া ছিলেন। কিন্তু ইঁহার দুর্ব্যবহারে সক্রেটিসের চিত্তের স্থৈর্য্য ও প্রসন্নতা কস্মিন্‌কালেও নষ্ট হয় নাই। সক্রেটিস্ সামান্য পদাতিকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তিনবার দূরদেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ক্ষুৎপিপাসায় তিনি কখনও কাতর হইতেন না; তাঁহার ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু লোক অতি অল্পই ছিল। তিনি সামান্য বেশে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন; কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কোন সময়েই পাদুকা ব্যবহার করিতেন না। একপ্রকার মোটা কাপড় তিনি সর্ব্বদা পরিধান করিতেন এবং তাঁহার আহারও যৎসামান্য ও পরিমিত ছিল।

সক্রেটিস্ যদিও খোদকের কর্ম্ম করিতেন, তথাপি তাঁহার মনের গতি অন্যদিকে ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চাহিলেন না, দরিদ্র থাকিয়া চিরকাল জ্ঞানোপার্জ্জন করিবেন, সত্যান্বেষণ করিবেন, ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল। তৎকালে এথেন্স্ নগরে যে সকল দার্শনিক পণ্ডিত আপনাদের মত প্রচার করিতেছিলেন,

সক্রেটিস্ তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া, অতি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিতেন, এবং তৎকালপ্রচলিত বহুবিধ গ্রন্থও তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা মিটিল না। তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সত্যান্বেষণের এক নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালী নিরূপণ করিলেন। কালক্রমে সক্রেটিস্ প্রকাশ্যভাবে এথিনীয় যুবকগণকে শিক্ষা ও উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে এথেন্স্ নগরে যে সকল শিক্ষক ও অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহারা বেতন-ভুক্ ছিলেন; সুতরাং ধনীর সন্তানগণকে শিক্ষা দেওয়াই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। সক্রেটিস্ এইরূপ কার্য্য অতি ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়া বিনা বেতনে সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট শিক্ষালয় ছিল না; কি রাজপথ, কি বাণিজ্যাগার, কি শৌণ্ডিকাপণ, সক্রেটিসের সর্ব্বত্রই গতিবিধি ছিল। এই সকল স্থানেই তিনি শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি যখন যেখানে গমন করিতেন, শিষ্যেরা সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। কিন্তু বহুলোকের শিক্ষক ও উপদেশক বলিয়া সক্রেটিসের মনে কখন জ্ঞানাভি-মান স্থান পাইত না; তিনি আপনাকে অতি হীন ও অজ্ঞ বলিয়াই জানিতেন। জ্ঞানী অথবা উপদেষ্টা বলিয়া তিনি কখনও আত্মপরিচয় দিতেন না। তিনি কিছুই জানেন না ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল; তিনি কিছুই বুঝেন না, ইহাই

তাঁহার বিশ্বাস ছিল। সক্রেটিস্ কখনও কোনও বিষয়ে লিখিয়া আপনার মত ব্যক্ত করেন নাই। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে তাঁহার শিষ্য প্লেটো ও জেনোফনের গ্রন্থাদিই পাঠ করিতে হয়। এই শিষ্যদ্বয়ই সক্রেটিসের জীবনের অপূর্ব্ব রত্ন সকল রক্ষা করিয়া আশ্চর্য্য গুরুভক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া লোকেরা সত্য লাভ করিবে, ইহাই সক্রেটিসের মত ছিল। যথার্থ জ্ঞানের উদয় না হইলে যে প্রকৃত নৈতিক জীবন গঠিত হইতে পারে না, ইহাও তিনি বিশ্বাস করিতেন। এই সকল মতের জন্যই তিনি দেশের লোকের শত্রু হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শত্রু বৃদ্ধির আরও একটী গুরুতর কারণ ছিল। তাঁহার প্রখর বুদ্ধি, অতুল তর্কশক্তি ও গভীর জ্ঞানের নিকট এথিনীয় পণ্ডিতগণকে পরাভব মানিতে হইত। তিনি দার্শনিকগণকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের প্রচারিত ভ্রান্তিপূর্ণ মত সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া উড়াইয়া দিতেন। দেশের চিরপ্রচলিত সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রচার করিয়া কোন নূতন মত প্রচলন করিতে গেলে যে, সমাজের আপামর সাধারণ খড়গহস্ত হইয়া উঠিবে. তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এথিনীয়গণ প্রচার করিতে লাগিল যে, "সক্রেটিস্ নগরের নব্য সম্প্রদায়কে অসৎ উপদেশ দিতেছেন, নূতন মতের সৃষ্টি করিতেছেন, এবং জাতীয় দেবতাগণকে অমান্য করিয়া নাস্তিকতা বিস্তার করিতে-

ছেন।” এইরূপে জনসাধারণ যখন সক্রেটিসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তখন অতি সামান্য এক ব্যক্তি অপর দুইজন লোকের পোষকতায় সক্রেটিসের নামে ধর্ম্মাধিকরণে এক অভিযোগ উপস্থিত করিল। সক্রেটিস্ নগরের দেবতা-গণকে পূজা করেন না; তিনি যুবকগণকে কুপথগামী করিতেছেন; এইরূপ অপরাধে সক্রেটিস্ অভিযুক্ত হইলেন। এই অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে শুনিয়া তাঁহার শিষ্যগণ যারপরনাই চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা সক্রেটিসের পক্ষসমর্থনের জন্য উকিল নিযুক্ত করিতে চাহিলেন, এবং অন্যান্য উপায়ে সক্রেটিস্‌কে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সক্রেটিস্ একটুকুও বিচলিত হইলেন না। তিনি কি করিলেন? তাঁহাকে এই ভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া যখন তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা চতুর্দ্দিকে আস্ফালন করিতেছিল, তাঁহার পরিণাম চিন্তা করিয়া যখন তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ ও ভক্তগণ গভীর দুঃখে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তখন সেই মহাপুরুষ আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা শুনিয়া একবারমাত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া সম্পূর্ণরূপে নীরব হইলেন। তিনি বীরের ন্যায় বিচারকগণের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি আপন নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করিলেন না; বিচারকদিগের কৃপার ভিখারী হইয়া স্বীয় জীবন রক্ষার জন্যও প্রার্থনা করিতে ঘৃণাবোধ করিলেন। তিনি এথিনীয়গণকে সম্বোধন করিয়া একটী সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা করিলেন। সক্রেটিসের বক্তৃতা শেষ হইলে

তাঁহার বিচারকদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁহাকে দোষী স্থির করিল। কিন্তু তাহারা সক্রেটিসের প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশ করিল যে, সক্রেটিসের প্রতি যে দণ্ডবিধান হইবে তিনি ইচ্ছা করিলে তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোন উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করিতে পারিবেন। সক্রেটিস্ এই দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া বিচারকগণকে কহিলেন, 'আমি আপনাকে একবারও অপরাধী জ্ঞান করি না। বরং আমি যাহা করিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে পুরস্কার দেওয়াই তোমাদের উচিত। তবে নিয়মরক্ষার্থ আমার শিষ্য প্লেটো আমার জন্য কিছু অর্থ দিতে প্রস্তুত আছেন।' এই কথা শুনিয়া বিচারকগণ ক্রোধে জ্বলিতে লাগিল; তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিল।

প্রাণদণ্ডের আদেশের পর সক্রেটিস্ ত্রিশদিন কারারুদ্ধ ছিলেন। এই সময়ে তিনি শিষ্যগণের সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতেন এবং তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন; কিন্তু এ অবস্থায় কেহ কখনও তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখিতে পায় নাই। তাঁহার জনৈক শিষ্য তাঁহাকে পলায়ন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া চোরের ন্যায় পলায়ন করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

তাঁহার মৃত্যুদিন নিকটবর্ত্তী হইল। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে তিনি শিষ্যগণকে উপদেশ দিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ উপদেশ। শিষ্যগণ তাঁহার মুখে এই শেষ কথা শুনিলেন। মহাপুরুষের হস্তে বিষের পাত্র প্রদত্ত হইল;

তিনি অনায়াসে তাহা পান করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ধন্য মহাপুরুষ! সত্যের জন্য যাঁহারা প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত বীর; তাঁহাদের জীবন চিরদিনই দুর্ব্বল নরনারীগণের পক্ষে আলোকস্বরূপ, তাঁহাদের চরিত্র সর্ব্বত্রই পূজিত হইয়া থাকে।

মক্কা যাত্রা।

মুসলমানদিগের মহাতীর্থ মক্কার নাম তোমরা অবগত আছ। এই তীর্থেই ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মোহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থানেই তিনি ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করেন। হজরত মোহম্মদ তাঁহার শিষ্যদিগকে শারীরিক শক্তি ও প্রয়োজনীয় অর্থ থাকিলে, জীবনে অন্ততঃ একবার এই পুণ্য ভূমি মক্কার মন্দিরে আসিয়া তীর্থ করিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং মুসলমানদিগের নিকট এই স্থান পরম পবিত্র। মুসলমানদিগের তীর্থযাত্রার নাম হজ এবং যাঁহারা এই তীর্থ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে হাজী কহে। প্রতি বৎসর পৃথিবীর প্রায় সমুদয় দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এই স্থানে হজ করিতে একত্রিত হয়েন। সুতরাং এই স্থানের কথা শুনিতে হিন্দু-মুসলমান কাহার না ইচ্ছা হয়?

আমরা তোমাদিগকে একজন হাজীর নিজের মুখের বিবরণ শুনাইব।

"আমরা বম্বাই হইতে অর্ণবপোতে আরোহণ করিলাম। ভারতবর্ষের মুসলমানদিগকে বম্বাই বন্দরে অর্ণবপোতে আরোহণ করিতে হয়। বম্বাই ভারতবর্ষের পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। ইহা বাস্তবিক পক্ষে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি; কিন্তু এরূপভাবে দ্বীপগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত যে, সকলগুলিকে একটা দ্বীপ বলিয়া বোধ হয়। সমুদ্র ইহার ভিতরে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকেই ভূমি। সেই কারণেই ইহা এরূপ রমণীয়। বম্বাই নগরে মুসলমান যাত্রিদের অবস্থানের জন্য কতিপয় পান্থশালা আছে। আমি তাহার একটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পরদিন অর্ণবপোতে আরোহণ করিলাম। ঐ পোত তীর হইতে সমুদ্রের ভিতরে কিয়দ্দূরে দণ্ডায়মান থাকে। নৌকায় করিয়া তথায় যাইতে হয়। পোত যখন ছাড়িল, তখন দেখিতে দেখিতে স্থলের শেষ সীমা বিলুপ্ত হইল। আরব সাগরের মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে আমরা চলিলাম। অষ্টম দিবস অতিক্রান্ত হইলে অর্ণবপোত এডেনে পৌছিল। এডেন ইংরাজদিগের দ্বারা অধিকৃত। লোহিত সাগর ও আরব সাগরের প্রায় সঙ্গমস্থলে শুষ্ক ও দগ্ধ পর্ব্বতের উপরে ইংরাজেরা একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এস্থানে প্রায় সকল অর্ণবপোতই গতিরোধপূর্ব্বক কিয়ৎকাল অবস্থিত থাকে, এবং কয়লা সংগ্রহ করিয়া পুনরায় চলিতে থাকে। ইহারই উত্তরে

লোহিত সমুদ্র। লোহিত সমুদ্রের জল রক্তবর্ণ নহে, অন্যান্য সমুদ্রের জলেরই ন্যায় নীলবর্ণ। কিন্তু ইহার ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে কি ভীষণ গ্রীষ্মতাপ অনুভূত হয়! ইহার উভয় তীরে মরু-ভূমি বিদ্যমান। একদিকে আফ্রিকার মরুভূমি, অন্যদিকে আরবের মরুভূমি। উভয় দিক্ হইতে যখন তপ্ত বায়ু বহিতে থাকে, তখন অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হয়। এ সমুদ্রে প্রায়ই তরঙ্গ দৃষ্ট হয় না। মধ্যে মধ্যে জল স্রোতহীন হইয়া যাওয়ায় নিম্নদেশ হইতে নানা শৈবাল প্রভৃতি পদার্থ রাশীকৃত হইয়া জলকে মলিন করিয়াছে। সমুদ্রের মধ্যে উভয় পার্শ্বে শুষ্ক অনুর্ব্বর দগ্ধ শৈল দৃষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে দ্বীপও দৃষ্ট হয়। এডেনের পরে লোহিত সাগরে আমাদিগের অর্ণবপোতের বিশ্রাম করিবার দ্বিতীয় ষ্টেসন কামারান নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। কামারান পরিত্যাগ করিয়া দুই দিবস পরে আমাদিগের পোত জেড্ডায় গিয়া উপস্থিত হইল। মক্কাযাত্রী মুসলমানেরা এই বন্দরে অর্ণবপোত হইতে অবতরণ করেন। বম্বাইয়ের ন্যায়, ঐ অর্ণবপোত তীরভূমি হইতে সমুদ্রের মধ্যে কিয়দ্দূরে দণ্ডায়মান থাকে।

অর্ণবপোত জেড্ডার উপকূলে উপস্থিত হইবামাত্র, তীর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী আসিয়া উহাকে বেষ্টন করিল। শত শত নাবিক রজ্জুর সাহায্যে অর্ণবপোতের উপর উঠিয়া আসিল। তাহাদের ইচ্ছা যাত্রিগণকে তৎক্ষণাৎ নামাইয়া লইয়া যায়। আরবীয় নাবিকগণ প্রায়ই চৌর্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শী। সুতরাং কেহই সে রাত্রে যাত্রিদিগকে অবতরণ করিতে পরামর্শ দিল না।

মক্কানগর জেড্ডার প্রায় ৬৩ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। উষ্ট্র ভিন্ন আরব দেশের মরুভূমিতে অন্য যানবাহন নাই। আমার জন্য একটা উষ্ট্র আসিল। উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক আমরা মক্কার দিকে অগ্রসর হইলাম। মরুভূমির মধ্য দিয়া আমরা চলিলাম। মধ্যে মধ্যে এক একবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকাময় পর্ব্বত চক্ষুর সম্মুখে উদিত হয়। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই সমতল ভূমি লক্ষিত হয়।

জেড্ডা হইতে ১৮ মাইল দূরে বিশ্রাম করিবার স্থান। ১৮ মাইল চলিতে সমস্ত দিন শেষ হইয়া গেল। সন্ধ্যাকালে সেদিনকার মত যাত্রা বন্ধ রহিল। বিশাল বালুকাময় মরুমধ্যে খর্জ্জুরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ভূমিতে শ্রেণীবদ্ধ রূপে প্রোথিত করিয়া কয়েকটি চতুষ্কোণ ভূমিখণ্ড সীমাবদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে। সেইগুলির নামই পান্থশালা। উপরে নক্ষত্র-পরিশোভিত স্বচ্ছ আরবীয় আকাশ, আর নিম্নে সেই অবিচ্ছিন্ন অনাবৃত বালুকাস্তর। এক একটি চতুষ্কোণ ভূমি এক এক দল প্রহরীর অধীনে রক্ষিত। অবরোধের ভিতর প্রবিষ্ট হইলে আর কাহারও বাহির হইবার উপায় নাই। গণ্ডীর বাহিরে পদক্ষেপ করিলেই সর্ব্বনাশ। বদ্দুগণ লুণ্ঠন করিয়া লইবে। তাহারা আরব দস্যু। পথক্লিষ্ট যাত্রিগণ কোন ক্রমে ভয়ে ভয়ে রাত্রি যাপন করিলেন; রাত্রি প্রভাত হইলে পুনরায় যাত্রা আরব্ধ হইল।

যাহা হউক পরদিন আমরা মক্কায় পৌঁছিলাম। আরফাৎ-

নামক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, রূম অর্থাৎ তুর্করাজ্য হইতে নিযুক্ত জনৈক পুরোহিত পর্ব্বতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া মক্কার দিকে মুখ করিয়া আরাধনা করেন এবং কোরাণ শরিফের কিয়দংশ পাঠ করেন। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে সহস্র সহস্র মনুষ্য উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার আরাধনা শ্রবণপূর্ব্বক তাহাতে যোগদান করেন। জগতে যেখানে যেখানে মুসলমান আছেন, তত্তৎ দেশ হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ সমাগত হইয়া আরফাতের প্রান্তরে একত্রিত হইয়া থাকেন। এইস্থানে লক্ষাধিক লোক সমাগত হয়েন। এত লোকের পক্ষে এক জন পুরোহিতের মুখনিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করা সম্ভব নহে; এই নিমিত্ত আরাধনার প্রারম্ভে ও শেষে কামান হইতে গোলা বর্ষণ পূর্ব্বক সকলকে সংবাদ দেওয়া হয়।

তাহার পরে কোরবানি বা বলিদান। হজের প্রান্তরে মৃত পশুগণের মাংস এত অধিক স্তূপীকৃত হয় যে, হাজীগণ সেই সমস্ত মাংস লইয়া আসিতে পারেন না। স্তূপাকার মাংসরাশি বদ্দু ও দীনদুঃখিগণ লইয়া যায়।

হজের প্রধান কার্য্য আরফাতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহার পর মক্কা ইত্যাদি তীর্থ পরিদর্শন হয়। মক্কা একটি বালুকাময়ী উপত্যকায় অবস্থিত। নগরের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। বাটীগুলি অধিকাংশই প্রস্তরনির্ম্মিত। কোন কোন বাটী চার পাঁচ তলা পর্য্যন্ত উচ্চ। পথগুলি প্রশস্ত। যাত্রিগণের অবস্থানের নিমিত্ত অনেক বাটী পাওয়া যায়। স্নান করিবার জন্য অনেক গুলি হাম্‌মাম্‌ বা স্নানাগার আছে।

নগরে ধার্ম্মিক যাত্রিগণের পরিদর্শনীয় অনেকগুলি স্থান আছে। তাহার মধ্যে মুসলমানদিগের কাবা নামক পরম পবিত্র স্থানই সর্ব্ব-প্রথমে উল্লেখযোগ্য। এই স্থানে সংগ-আসওয়াদ নামক একটি কৃষ্ণশিলা আছে। যাত্রিগণ উহাকে চুম্বন বা স্পর্শ করেন এবং কাবার চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করেন। আমি অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া এই কৃষ্ণশিলা স্পর্শ করিলাম এবং চুম্বন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। কত বিশ্বাসী ব্যক্তির ভক্তির অশ্রু ইহার উপর পতিত হইয়াছে—কত পবিত্র স্মৃতি বহন করিয়া ইহা মুসলমানদের প্রাণে আনন্দধারা বর্ষণ করে। মক্কার মস্‌জিদ ও কাবা ব্যতিরেকে জম্‌জম্ নামক একটি কূপ আছে, তাহার জল অতি পবিত্র। বলা বাহুল্য, আমি এ জলে স্নান করিলাম এবং পথের সমুদয় ক্লেশ বিস্মৃত হইলাম—আমার শরীর শীতল হইল।

মক্কা দর্শন সমাপ্ত হইলে যাত্রিগণ অনেকে মদিনা দর্শন করিতে গিয়া থাকেন। এইক্ষণে মদিনা হইতে মক্কায় রেল হইয়াছে। মদিনা হজরত মহম্মদের পবিত্র সমাধিস্থান।"

পৃথিবীতে শ্বেতাঙ্গজাতির বিস্তার।

ইংরাজ-সাম্রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্তমিত হয় না, এই প্রবাদ-বচন কাহারও অবিদিত নাই। পৃথিবীর মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এসিয়া, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, পলিনেসিয়া ও

আমেরিকা মহাদেশ—সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র ইংলণ্ড-দ্বীপবাসিগণের বিপুল সাম্রাজ্য লক্ষিত হইবে। পৃথিবী-পৃষ্ঠের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া ইঁহারা পৃথিবীর তাবৎ তত্ত্ব, তাবৎ বৃত্তান্তই অবগত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে, জগতের মানব-জাতির মূল বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্বেতাঙ্গ জাতির বিস্তারের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিব।

জগতে মানবজাতি তিন প্রধান মূল শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম, ককেসীয় অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ জাতি; দ্বিতীয়, নিগ্রো অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ জাতি এবং তৃতীয়, মঙ্গোলীয় অর্থাৎ পীতবর্ণ জাতি।

ককেসীয় জাতির অন্য এক নাম ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি। সমগ্র ইউরোপ, আরব দেশ, পারস্য দেশ, আফ্‌গানিস্থান, ভারতবর্ষ, এসিয়ামাইনর এবং আফ্রিকার উত্তর খণ্ডের কিয়দংশ এই জাতির বাসস্থান। ইহাদিগের দৈহিক লক্ষণ সর্ব্বত্র এক-প্রকার। শুভ্রবর্ণ, প্রশস্ত মস্তক, উন্নত ললাট ও উন্নত নাসা—এই জাতির দৈহিক বিশেষত্বের লক্ষণ।

মঙ্গোলীয় জাতি উত্তর, মধ্য এবং পূর্ব্ব এসিয়া এবং ইউরোপের বিচ্ছিন্ন কতকগুলি স্থানে বাস করে। পীতবর্ণই ইহাদিগের প্রধান বিশেষত্ব, এতদ্ব্যতীত ইহাদিগের মস্তক দীর্ঘায়ত, ললাট অনুন্নত, নাসা অনুচ্চ এবং কপোলাস্থিসকল ঈষদুচ্চ। চীন জাতি, জাপানী জাতি ও তাতারগণ এই পীতশ্রেণীভুক্ত। উত্তরমেরুবাসী এস্কিমো প্রভৃতি জাতি এই একই শ্রেণীর অন্তর্গত।

নিগ্রো জাতি, মধ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পলিনেসিয়ার সামান্য অংশ অধিকার করিয়া আছে। ইহাদিগের মস্তক ক্ষুদ্র, ওষ্ঠ স্থূল—দেখিলেই চিনিতে বিলম্ব হয় না।

অবশ্য এস্থানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, মূলশ্রেণীত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত জাতিসকল নানা কারণে বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। শাখা প্রশাখা অসংখ্য হইলেও বৃক্ষমূল যেরূপ এক, সেইরূপ এই তিন মূলশ্রেণী সমানই রহিয়াছে। যে কোন জাতির যতই বৈচিত্র্য থাকুক না—তাহা কোন্ মূলশ্রেণীর অন্তর্গত তাহা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা কঠিন নহে।

জীবজন্তুদিগের মধ্যে দেখা যায় যে, তাহারা যে বিশেষ জলবায়ুর মধ্যে সংস্থিত হইয়াছে ও পুরুষানুক্রমে যেস্থানে বাস করিয়াছে, তথা হইতে তাহাদিগকে অন্যদেশে ভিন্ন প্রকারের জলবায়ুর মধ্যে লইয়া গেলে তাহাদিগের পক্ষে প্রাণধারণ করাই অসম্ভব হয়। কিন্তু মনুষ্যের সম্বন্ধে সেরূপ কোন নিয়ম নাই। উত্তরমেরুবাসী শ্বেত ভল্লুক বা সীলকে যদি উষ্ণপ্রধান দেশে কোন উপায়ে জীবিতাবস্থায় আনয়ন করা যায়, তবে বহু আয়াস স্বীকার সত্ত্বেও তাহাকে দুই চারি দিবসও সঞ্জীবিত রাখা যায় কিনা সন্দেহ। জীবজন্তুদিগের শরীর, খাদ্য, অভ্যাস সমস্তই যে দেশে বাস করে, তদ্দেশীয় ভূপ্রকৃতি অনুসারে গঠিত এবং স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। অথচ মনুষ্য উত্তরমেরুই বল, আফ্রিকার উত্তপ্ত সাহারা মরুই বল, যে কোন দেশে, যে কোন জল-বায়ুর মধ্যে বাস করিতে পারে। স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র

বাস করা অসম্ভব—মনুষ্যের সম্বন্ধে কদাপি এই কথা প্রযোজ্য নহে।

শ্বেতাঙ্গ জাতি এই কথাটি নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত করিয়াছে। অধুনা ভূমণ্ডলে এরূপ কোন দেশের নাম করা যায় না, যে দেশে শ্বেতাঙ্গ জাতি বাস করিতেছে না। ইহাদিগের অসামান্য বীরত্ব, কষ্টসহিষ্ণুতা, সর্ব্বপ্রকারের প্রতিকূল অবস্থাকে আপনার বশীভূত করিবার অদম্য উৎসাহ, জগতের মধ্যে ইহাদিগকে শ্রেষ্ঠ জাতি করিয়াছে। অবশ্য শ্বেতাঙ্গ জাতি বলিতে এক্ষণে ইউরোপীয় জাতিগুলিকেই বুঝাইয়া থাকে।

পৃথিবীর ইতিহাসে, যে জাতি যখন সুসভ্য হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ অন্যান্য জাতিবর্গকে সর্ব্ববিষয়ে বহুগুণে অতিক্রম করিয়াছে, সেই জাতিই তখন এক একবার দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছে, এইরূপ দেখা যায়। প্রাচীন মিসরজাতি একসময়ে এইরূপ বাহির হইয়াছিল। মহাবীর আলেকজান্দার গ্রীক্ জাতিকে এক সময়ে এসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্ত ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। মুসলমানগণ এক সময়ে আরব মরুভূমি হইতে বহির্গত হইয়া একদিকে সুদূর স্পেন, অন্যদিকে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত, আপনাদিগের বিজয়পতাকা সর্ব্বত্র উড্ডীন করিয়াছিল। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ জাতির বিস্তারের ন্যায় এরূপ জগদ্ব্যাপী বিস্তার কুত্রাপি কোনকালেই দৃষ্ট হয় নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কি দুর্দ্দমনীয় আবেগে স্পেন হইতে, পর্ত্তুগাল হইতে, হল্যাণ্ড হইতে, ইংলণ্ড হইতে, দলে দলে নাবিকগণ পথচিহ্নহীন অকূল সমুদ্রে তরণী

ভাসাইয়া পৃথিবীর সর্ব্বস্থান আবিষ্কার করিবার আশায় বহির্গত হইয়াছিল, তাহাদিগের সেই আশ্চর্য্য সাহসের কি কোথায়ও তুলনা আছে ? মহাত্মা কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন ; ম্যাগেলন্, দক্ষিণ আমেরিকা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রশান্তমহাসাগরে প্রাণত্যাগ করিলেন ; ভ্যাস্‌কোডিগামা, আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতবর্ষে পেঁ।ছিলেন ; ইংরাজ-নাবিক ড্রেক, সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আসিলেন ; এবং ট্যাস্‌ম্যান্, নিউজিল্যাণ্ড আবিষ্কার করিলেন। এই পৃথিবী আবিষ্কারের জন্য কত প্রাণই অতল-সমুদ্র-গর্ভে বিনষ্ট হইয়াছে, কত দুঃসহ ক্লেশ মনুষ্যকে সহ্য করিতে হইয়াছে। ইহার ইতিহাস কি আশ্চর্য্য !

সেইজন্য এক্ষণে পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে সর্ব্বত্রই শ্বেতকায় জাতিগণ উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া পৃথিবীর সকল স্থানকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। প্রথমতঃ এসিয়া মহাদেশে, ভারতবর্ষে, ইংরাজ জনসংখ্যা এক লক্ষের উপর হইবে না ; কিন্তু ভারতবর্ষের জলবায়ু শীতপ্রধান দেশবাসিগণের পক্ষে যে কি ভয়ঙ্কর, তাহা বিবেচনা করিলে এই এক লক্ষ জনসংখ্যাই বিস্ময়কর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

রুশগণ য়ুরাল পর্ব্বত হইতে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর এসিয়া অধিকার করিয়াছে, দক্ষিণে পারস্য ও আফগানিস্থানের উত্তরে সকল দেশই তাহাদের শাসনাধীন। সাইবিরিয়া প্রায় জনশূন্য, তথাপি লক্ষাধিক রুশ প্রতিবৎসর তথায় প্রবেশ করে।

ফরাসিগণ কোচিন চায়নার অধিকারী। এতদ্ব্যতীত চীন, জাপান, পারস্য প্রভৃতি স্বাধীন দেশেও বাণিজ্য ব্যবসায় উপলক্ষে বহু ইউরোপীয় ব্যক্তি বাস করিতেছেন।

তৎপরে আফ্রিকা মহাদেশ ধরা যাউক্। আফ্রিকা মহাদেশ ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মাণ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিগণ একপ্রকার ভাগ করিয়া লইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকার জলবায়ু অতি সুন্দর, তজ্জন্য তথায় ইংরাজ উপনিবেশ হইয়াছে। মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া কত শ্বেতকায় ইংরাজ সপরিজনে তথায় কৃষিকর্ম্মে ও খনির কর্ম্মে জীবিকা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক আনন্দে বাস করিতেছেন। আফ্রিকার পূর্ব্বে এবং পশ্চিমেও ইংরাজাধীন রাজ্য আছে।

অ্যালজিরিয়া প্রভৃতি আফ্রিকার উত্তরভাগস্থিত প্রদেশ ফরাসিগণ শাসন করিয়া থাকেন।

আফ্রিকায় কঙ্গো প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তাপাধিক্য। তথাপি হস্তীদন্ত, রবার প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য কঙ্গোতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া বেল্‌জিয়াম্ তাহা অধিকার করিয়াছে। প্রতি তিন বৎসরে দশজন ইউরোপীয়ের মধ্যে নয় জন, হয় মৃত নয় চিররুগ্ন হইয়া পড়ে, সে দেশের স্বাস্থ্য এতই দূষিত। তথাপি ইউরোপীয়গণ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই, উত্তরোত্তর তাহাদের দলবৃদ্ধি হইতেছে।

অষ্ট্রেলিয়া আর একটী মহাদেশ। পূর্ব্বে ইহা অসভ্য কৃষ্ণকায় জাতিদিগের বাসস্থান ছিল, এক্ষণে ইংরাজগণ তথায়

উপনিবেশ স্থাপন করাতে আদিম অসভ্য জাতির সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া কত ইংরাজ এই দেশে বসতি করিতেছেন।

১৬২১ খৃষ্টাব্দে একদল ইংরাজ আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন, তৎপরে তিন শতাব্দী কাল মধ্যে তাঁহাদিগের অধ্যুষিত আমেরিকার যুক্তরাজ্য এক প্রবল শক্তিসম্পন্ন বৃহৎ রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। ক্যানাডা ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধিকারে আসিয়া ইংরাজ শক্তিকে অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে একত্র বাসের দ্বারা মিলিত মিশ্রিত হইয়া এক মহাজাতি সংগঠিত করিয়াছে। এই দেশে সকলেই ইংরাজী ভাষায় কথা কহিয়া থাকে। এই দেশে কৃষি-বাণিজ্য শিল্প-বিজ্ঞান অতি দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করিতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকায় প্রথমে স্পেনেরই আধিপত্য ছিল। স্পেনবাসিগণ আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণের উপর লোমহর্ষক অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা করিয়া সে দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তপ্ত লৌহের দ্বারা তাহাদিগের ললাটে ফার্দ্দিনন্দ রাজার নাম মুদ্রিত করা হইত, গলিত সীসা মস্তকে বর্ষণপূর্ব্বক তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করান হইত। এরূপ অত্যাচারের কাহিনী অন্যত্র কোথাও শ্রুত হওয়া যায় না। পরবর্ত্তীকালে সমস্ত দেশগুলি স্পেনের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইল। সমুদায় দক্ষিণ আমেরিকাতে স্পেনের রাজ্য

অধুনা একটিও অবশিষ্ট নাই। ব্রাজিল, পর্ত্তুগিজগণের অধিকারে ছিল; বৎসরে বৎসরে স্বর্ণ হীরক প্রভৃতি বহুমূল্য ধাতু ব্রাজিল হইতে পোতপূর্ণ করিয়া পর্ত্তুগিজগণ স্বদেশে লইয়া যাইত। এক্ষণে তাহাও স্বাধীন হইয়াছে।

নদী ও তাহার কার্য্য।

বৃষ্টি পতনের কালে তোমরা অনেকেই নিজ গ্রামে বা সহরে পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া জলধারাগুলিকে কোন নিম্ন স্থানে মিলিত হইতে দেখিয়াছ। সামান্যমাত্র লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, ভূমি যেদিকে অপেক্ষাকৃত নিম্নাভিমুখী, জলধারাগুলি সেই দিকেই মিলিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। ক্রমে হয়ত কোন নর্দ্দামায় বা খালে সেই জল গিয়া পড়িবে।

নদীও এইরূপেই গঠিত হয়। পর্ব্বতে যে বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির কতকাংশ পর্ব্বতগাত্রের ঢালু দিয়া বহিয়া যায়; অবশিষ্টাংশ পর্ব্বতের ভিতর হইতে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরণার আকারে নিম্নে বহির্গত হয়। অনেক সময় তুষার বিগলিত হইয়াও জলধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। উপর হইতে বেগে নিম্নে অবতরণ করে বলিয়া সেই ধারাগুলির স্রোত যথেষ্ট প্রবল হয়। পর্ব্বতের

পাদদেশে অনেকগুলি ধারা আসিয়া যখন মিলিত হয়, তখনই তাহা নদীর আকার প্রাপ্ত হয়।

তোমরা অবশ্য লক্ষ্য করিয়াছ, নর্দ্দমা বা নালা দিয়া যখন বৃষ্টির জল প্রবাহিত হইয়া যায়, তখন তাহা কিরূপ মলিন ও কর্দ্দমাক্ত থাকে। কেবল তাহাই নহে, যদি তোমাদের গ্রামের নিকট কোন নদী থাকে, তাহা হইলে তোমরা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, বৃষ্টির পর তাহার জল কিরূপ মলিন হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—বৃষ্টির জল প্রবাহিত হইয়া যাইবার কালে ভূপৃষ্ঠের বালুকা, মৃত্তিকা ইত্যাদি ধৌত করিয়া লয় এবং সেই জন্যই তাহা এরূপ মলিন হয়। এ সকল মলিন জল নদীতে পতিত হইয়া তাহার জলকেও কর্দ্দমাক্ত করে। বৃষ্টির পূর্ব্বে অনেক বস্তু মৃত্তিকার নিম্নে প্রচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু বৃষ্টির পরে তাহারা মৃত্তিকার উপরিভাগে দৃষ্ট হয়। বৃষ্টির জলে উপরের মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যাওয়াতেই মৃত্তিকার নিম্নস্থিত বস্তুসকল এরূপ অনাবৃত হয়।

বৃষ্টির জল সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, জলের স্রোত যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়, তাহা পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অপেক্ষা নিম্নতর হয়। দ্বিতীয়তঃ, বৃষ্টির জল যদি কোন নিম্ন স্থানে সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে পরদিবস তাহাকে আর সেরূপ কর্দ্দমাক্ত বোধ হয় না—তাহা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত হইয়া যায়। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত ডোবা বা গর্ত্তে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হয়, তাহা ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া আইসে।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, স্রোতের জল আপনার পথ প্রস্তুত করিয়া লয়। যে স্রোত যত প্রবল, তাহার নিজের পথ প্রস্তুত করিবার শক্তিও তত অধিক। জল যতক্ষণ চলিতে থাকে, ততক্ষণ জলের পঙ্ক নিম্নে পতিত হইবার সেরূপ সুবিধা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু তাহার গতি যতই মন্দীভূত হইয়া আইসে, জলে মিশ্রিত কর্দ্দম ততই নিম্নে যাইতে থাকে। অবশেষে জল যখন একেবারে স্থির হইয়া যায়, তখন তৎকর্ত্তৃক ভূপৃষ্ঠ হইতে সংগৃহীত তাবৎ বস্তুই নিম্নে পড়িয়া যায়। এই জন্যই বৃষ্টির পরের দিন ভূমিতে সঞ্চিত জল পরিষ্কৃত হয়; এইরূপে বালুকা ও কর্দ্দম যতই নিম্নে পতিত হয়, সেই স্থান ক্রমে ততই উচ্চ হইয়া উঠে।

বৃষ্টির জলের সম্বন্ধে যাহা দেখিলে নদীর সম্বন্ধেও তাহাই ঘটে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্রবণের জল যখন নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন সেই জল ভূপৃষ্ঠ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ড, মৃত্তিকা প্রভৃতি বহন করিয়া লইয়া চলে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারা যখন সম্মিলিত হইয়া প্রবলতর মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন তাহাদের বহন করিবার শক্তিও বর্দ্ধিত হয়। নদীর উৎপত্তিস্থলে, পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ হইতে নিম্ন ভূমির ঢালু অপেক্ষাকৃত অধিক। সুতরাং তথায় নদীর গতিও দ্রুততর হয়। এই জন্য কর্দ্দম, প্রস্তর প্রভৃতি যাহা নদী বহন করিয়া লইয়া আইসে, তাহা নিম্নে পতিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে পৌঁছিলে তাহার গতি মন্দীভূত হইয়া আইসে। সুতরাং

অপেক্ষাকৃত গুরুভার দ্রব্যসমূহ নিম্নে পতিত হইতে থাকে। অবশেষে সমুদ্রে পৌঁছিলে তাহার জল অপেক্ষাকৃত স্থির হইয়া যায়। তখন তাহার কৰ্দ্দম প্রভৃতি সঙ্গমস্থলে সঞ্চিত হইয়া নূতন ভূমি গঠিত করিতে থাকে।

তোমাদের গ্রামের নিকট কোনও নদী থাকিলে এ ব্যাপার তোমাদের নিকট নূতন বোধ হইবে না। তোমরা দেখিয়া থাকিবে যে, যে স্থানেই নদীর স্রোত বাধিত হইবার কোনও কারণ ঘটিয়াছে, সেই স্থানেই নদী নূতন চর প্রস্তুত করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে এরূপ নদী নাই যাহার মধ্যে কোনও স্থানে চড়া পড়ে নাই।

বাঙ্গালা দেশে নদীর এই উপদ্রব অহরহ সঙ্ঘটিত হইতেছে। নদীতীরস্থিত কত গ্রাম, কত সমৃদ্ধ জনপদ একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। পুনরায় কত নূতন গ্রাম, নূতন সহর গঠিত হইয়াছে। কত নদী তাহার পূর্ব্ব খাত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া নূতন খাত প্রস্তুত করিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের সময় ভাগীরথী পলাশীক্ষেত্রের নিম্নে প্রবাহিতা ছিল, এক্ষণে সে স্থান হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। গঙ্গা, ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা প্রভৃতি নদীর গত দশ বৎসরের মধ্যেই কতই না পরিবর্ত্তন হইয়াছে—পূর্ব্বের ত কথাই নাই।

কিন্তু কেবল বাঙ্গালা দেশ নহে—সমগ্র এসিয়াখণ্ডে নদীসমূহ যেরূপ এক দিকে পুরাতন উচ্চ ভূমিখণ্ড সকল ক্ষয় করিতেছে, অন্য দিকে সেইরূপ নূতন ভূভাগ সৃষ্টি করিতেছে।

কোটী কোটী বৎসর ধরিয়া এই ক্ষয় ও সৃষ্টিকার্য্য চলিতেছে কারণ, কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে মানুষ যখন পৃথিবীতে উপস্থিত হয় নাই, তখনও নদী ছিল এবং মেঘ এখনকার কালের অপেক্ষা অনেক অধিক বারি বর্ষণ করিত। সেই আদিম যুগ হইতে নদী সকল এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছে এবং তাহার যুগান্তরব্যাপী পরিশ্রমের ফলস্বরূপ কত পুরাতন ভূমিখণ্ড সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। কোথায়ও দুটি একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত অতীত উচ্চভূমির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কত শস্যশ্যামল বিস্তীর্ণ প্রান্তর সৃষ্ট হইয়াছে। এসিয়ার যে সমুদয় বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রের বিষয় ভূগোলে পাঠ করা যায়, তাহাদের অধিকাংশই এইরূপ নদীধৌত মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্ট।

মনঃসংযম।

ছাত্রজীবনে মনঃসংযম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক। মনের উপর আধিপত্য না থাকিলে, মন দশদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে, কোন ছাত্রই উন্নতিলাভের আশা করিতে পারেন না। পাঠে মনোনিবেশের অভাবে অধিকাংশ ছাত্রকেই অকৃতকার্য্য হইতে দেখা যায়। পাঠ আয়ত্ত করিবার কালে বিদ্যার্থীর মন যদি পাঠ্যবিষয়ে সংলগ্ন না হইয়া অন্যান্য বিষয়ে

ঘুরিতে থাকে, তাহা হইলে পাঠতো আয়ত্ত হয়ই না, এবং চিত্তবিক্ষেপের কুঅভ্যাস দাঁড়াইয়া গেলে, ইহার পরে শত চেষ্টাতেও মনঃস্থির করা বিদ্যার্থীর পক্ষে একপ্রকার দুঃসাধ্য সাধন হয়। মনকে সংযত করিবার অভ্যাস বালককাল হইতেই করা উচিত।

পৃথিবীতে যাঁহারা জ্ঞানী ও বিদ্বান্ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মনঃসংযমের শক্তি অসাধারণ। বস্তুতঃ এই শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে জ্ঞানার্জ্জনের প্রয়াস নিষ্ফল হয়। কেবল জ্ঞানার্জ্জনের বা বিদ্যার্জ্জনের কথাই বলিতেছি কেন, মনঃসংযম না থাকিলে কোন কর্ম্মেও সিদ্ধিলাভ করা যায় না। যাহার মন দশদিকে বিক্ষিপ্ত, সে কেমন করিয়া কোন কর্ম্মকে সুসম্পন্ন করিবে? প্রত্যেক কর্ম্মের ভিতরেই একটী উদ্দেশ্য থাকে, সেই উদ্দেশ্যকে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। তৎপরে একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক সেই উদ্দেশ্য সাধনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়। তখন যে সাবধানতা, সুবিবেচনা, তৎপরতা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা মনঃসংযমের আবশ্যকতা হয়, বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তির মধ্যে সেই সকল সদ্‌গুণ থাকা একেবারেই অসম্ভব।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিউটনের অসাধারণ মনঃসংযম ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে গল্প আছে যে, একদা নিউটন্ তত্ত্বালোচনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, এমত সময়ে জনৈক ভদ্র মহিলা, তাঁহার সহিত কোনও কার্য্যোপলক্ষে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। সেই

মহিলা নিউটনের অধ্যয়ন-গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, নিউটন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। রমণী নিউটনের চিন্তা ভঙ্গ করিতে সাহস না করিয়া কিয়ৎকাল তাঁহার আসনের পশ্চাতে দণ্ডায়মানা রহিলেন। নিউটন্ চুরুট খাইতে খাইতে এক একবার নিকটস্থা মহিলার গাত্রবস্ত্রে চুরুটের ছাই মুছিতেছিলেন। যখন তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল, আলোচনা শেষ হইল, তখন আসন হইতে উঠিয়া সেই মহিলাকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহার গাত্রবস্ত্রে চুরুটের ছাই দেখিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন। নিউটন্ অতি কাতরভাবে সেই মহিলার নিকট বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহিলা বলিলেন, "আপনি যেরূপ চিন্তামগ্ন ছিলেন, তাহাতে আপনার দুঃখ প্রকাশ করিবার কোন কারণই দেখিতেছি না।"

গ্রীক গণিতশাস্ত্রবেত্তাদিগের মধ্যে আরকিমেডিস্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার সহিত সাইরাকিউসের নৃপতির সম্পর্ক ছিল। কথিত আছে, নৃপতি একদা স্বর্ণকারের দ্বারা একটা স্বর্ণমুকুট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। স্বর্ণকার মুকুট প্রস্তুত করিয়া রাজার হস্তে প্রদান করিলে, নরপতি আরকিমেডিস্‌কে সেই মুকুটে অকৃত্রিম স্বর্ণ ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থ মিশ্রিত হইয়াছে কিনা তাহা নির্ণয় করিতে দেন। আরকিমেডিস্ একাগ্রচিত্তে এই বিষয় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে একটী ঝরণার নিকট গমন করিলেন। তখন ঝরণার নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাধার (চৌবাচ্চা) থাকিত, লোকেরা

তাহার ভিতরে বসিয়া স্নান করিত। আরকিমেডিস্ চিন্তাযুক্ত মনে হঠাৎ একটী জলাধারের মধ্যে বসিলেন; বসিবামাত্র জলাধারের কিয়ৎ পরিমাণ জল উছলিয়া পড়িয়া গেল। আরকিমেডিস্ তৎক্ষণাৎ সেই অবস্থায় "পাইয়াছি, পাইয়াছি" বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। ভূতগ্রস্তের ন্যায় সত্যগ্রস্ত হইয়া আরকিমেডিসের বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি নরপতির নিকট উপস্থিত হইয়াও পুনঃ পুনঃ "পাইয়াছি পাইয়াছি" বলিয়া আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

নরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পাইয়াছ?" আরকিমেডিস্ তখন যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, রাজসমীপে সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করিলেন।

আরকিমেডিসের মনঃসংযমের কথা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। গ্রীকেরা যখন সাইরাকিউস জয় করিবার জন্য নগর বেষ্টন করিয়াছিলেন, তখন আরকিমেডিস্ নগর রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ অবস্থাতেও তাঁহার গণিতচর্চ্চার বিরাম ছিল না। শত্রুসৈন্য যখন সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া নগরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল, তখনও তিনি বালুকারাশির উপরে ক্ষেত্রতত্ত্বের চিত্রসকল অঙ্কিত করিতেছিলেন। শত্রুসৈন্য যখন তাঁহাকে বধ করিবার জন্য তাহার কেশাকর্ষণ করিয়াছে, তখনও তিনি গণিত-তত্ত্বে মগ্ন। একবার মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক শত্রুসৈন্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আবার

চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। শত্রুগণ যখন সজোরে আঘাত করিল, তখন কেবল একবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সাবধান! আমার অঙ্কপাত যেন মুছিয়া যায় না!"

রাজ-পুরোহিত।

রাজপুতানার অন্তর্গত চিতোরের মহারাণা প্রতাপসিংহ শৌর্য্য, বীর্য্য, ও রণ-পরাক্রমে রাজপুত রাণাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শক্তসিংহ একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার বাল্য বয়সের সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া প্রবীণ রাজপুত বীরগণও বিস্মিত হইয়াছিলেন। একদা চিতোরের মহারাণা উদয়সিংহের রাজ-সভাতে একজন অস্ত্র-বিক্রেতা একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিল। রাজা, ছুরিকার তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিবার জন্য জনৈক কর্ম্মচারীকে আদেশ করিলেন। পঞ্চমবর্ষীয় বালক শক্তসিংহ তখন রাজসভাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হঠাৎ অস্ত্র-বিক্রেতার হস্ত হইতে ছুরিকা লইয়া রাজাকে কহিলেন, "পিতঃ, আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি।" এই বলিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা স্বীয় বাহুতে বিদ্ধ করিলেন! তাঁহার বাহু হইতে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। কুমারের পরিধেয় বস্ত্র শোণিতে

সিক্ত হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বীর-বালক শক্তসিংহের মুখমণ্ডলে কষ্টের কোনও চিহ্নই লক্ষিত হইল না।

একদা এই ভ্রাতৃদ্বয় চিতোর হইতে দূরে এক অরণ্যে মৃগয়ার উদ্দেশে গমন করেন। হঠাৎ একটা লক্ষ্যভেদ লইয়া তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। বিবাদের অগ্নি প্রশমিত না হইয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াই চলিল। অবশেষে প্রতাপসিংহ ক্রোধে অন্ধ হইয়া এক ভীষণ শেল উত্তোলন করিলেন এবং সরোষে কহিলেন "আইস, কাহার লক্ষ্য অব্যর্থ, তাহা এইবার স্থির করা যাউক।" শক্তসিংহও উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "তাহাই হউক।" তখন উভয়েই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজপুতজাতির প্রথানুসারে যুদ্ধের পূর্ব্বে কনিষ্ঠ শক্তসিংহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপসিংহের চরণ-বন্দনা করিলেন। প্রতাপসিংহও তাঁহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে শেল লইয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন।

মৃগয়ার জন্য যে সকল লোক রাজভ্রাতাদিগের সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। তাহারা বুঝিল যে নিমেষের মধ্যেই ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে একজন মানবলীলা সম্বরণ করিবেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান করিবার সাহস তাহাদের মধ্যে কাহারও ছিল না। চিতোরের রাজ-পুরোহিত দূর হইতে এই ভীষণ ব্যাপার দর্শন করিয়া "মহারাজ, ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন!" এই কথা বলিতে বলিতে উভয় ভ্রাতার মধ্যস্থলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু

পুরোহিতের সেই ধীর, স্থির মূর্ত্তি দর্শন এবং তাঁহার সানুনয় বচন শ্রবণ করিয়াও ভ্রাতৃদ্বয় যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। রাজপুরোহিত সর্ব্বদাই রাজবংশধরগণের কল্যাণ কামনা করিতেন। রাজবংশধরগণ যাহাতে কুশলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তজ্জন্য তিনি দেবসেবা, স্বস্ত্যয়ন ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতেন। এক্ষণে রাজকুমারদ্বয়কে পরস্পরের নিধনে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। বারম্বার নানারূপে তাঁহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিবার প্রয়াস যখন নিষ্ফল হইল, তখন তিনি এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা স্বীয় বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজপুরোহিত আত্ম-হত্যা করিলেন বলিয়া, চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উত্থিত হইল। প্রতাপসিংহ ও শক্তসিংহ নিস্পন্দ নির্ব্বাক্ হইয়া কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। পুরোহিতের মৃতদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহারা আপনাদের ক্রোধজনিত আত্মবিস্মৃতির নিমিত্ত অনুতপ্ত হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে, তাঁহাদের একজনের প্রাণরক্ষার্থেই পুরোহিত স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন।

চিতোর-রাজবংশকে রক্ষা করিবার জন্য যে স্থানে পুরোহিত আত্ম-বলিদান করিয়াছিলেন, মহারাণা প্রতাপসিংহ সেই স্থানে একটী স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন। অদ্যাপি সেই স্মৃতি-স্তম্ভ পথিকদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া সেই পুরোহিতের আত্ম-বিসর্জ্জনের কাহিনীর স্মৃতি তাঁহাদের মনে জাগরূক করে।

পদ্যাংশ।

গুহকের সহিত ভরতের সাক্ষাৎ।

রামেরে আনিতে যায় সমস্ত কটক।
বাল বৃদ্ধ কেহ কারো না মানে আটক॥
অনন্ত সামন্ত চলে যুদ্ধসেনাপতি।
ভরতের সাথে চলে রথী মহারথী॥
আছেন যমুনা পারে রাম বনবাসে।
ভরত গেলেন তবে শৃঙ্গবের দেশে॥
পৃথিবী যুড়িয়া ঠাট এক চাপে যায়।
গঙ্গাতীরে বৈসে গুহ করে অভিপ্রায়॥
কোন রাজা আইসে বুঝি যুদ্ধ করিবারে।
আপনার ঠাট গুহ একঠাঁই করে॥
চিনিলেক বিলম্বে সে অযোধ্যার ঠাট।
আপন কটকে গুহ আগুলিল বাট॥
গুহ বলে দেখি ভরতের সেনাগণ।
শ্রীরামের সাথে আইসে করিবারে রণ॥
পরা'ল বাকল তারে পাঠাইল বনে।
রাজ্যখণ্ড নিল তবু ক্ষমা নাহি মনে॥
সাজ রে চণ্ডাল ঠাট চাপে দিয়া চড়া।
বিষম শরেতে মুই কাটি হাতী ঘোড়া॥

মার্ মার্ বলিয়া দগড়ে দিল কাঠি।
হেনকালে গুহ বলে ভরতেরে ভেটি ॥
শুনরে চণ্ডালগণ ব্যস্ত হও নাই।
আসিল ভরত শ্রীরামের ছোট ভাই ॥
যদি সে ভরত শ্রীরামেরে করে রাজা।
ভাল মতে করি তবে ভরতের পূজা ॥
ভরত আসিয়া থাকে শত্রু ভাবে যদি।
ভরতের ঠাট কাটি বহাইব নদী ॥
সাত পাঁচ গুহ ভাবিতেছে মনে মন।
হেনকালে সুমন্ত্র কহেন সুবচন ॥
আইলেন শ্রীরামেরে লইতে ভরত।
বল গুহ শ্রীরাম গেলেন কোন্ পথ ॥
ভরতেরে তবে গুহ নোয়াইল মাথা।
ভেট দিয়া গুহ তারে কহে সব কথা ॥
ভরত বলেন শুন চণ্ডালের রাজা।
কত দিন শ্রীরামেরে করিলা হে পূজা ॥
গুহ বলে এখানে ছিলেন দুই রাতি।
দুই রাত্রি এক ঠাঁই ছিলাম সংহতি ॥
এই পথে গেলেন তাঁহারা মহাবনে।
গঙ্গাপার করিয়া রাখিনু তিনজনে ॥
গুহস্থানে পাইয়া সকল সমাচার।
সেই পথে গমন হইল সবাকার ॥

তাহা এড়ি ভরত কতকদূরে গেলে।
তৃণশয্যা দেখিলেন এক বৃক্ষতলে॥
তদুপরে শুয়েছিলা রাম বনবাসী।
তৃণলগ্ন আছে পাট কাপড়ের দশী॥
আছাড় খাইয়া পড়ে ভরত ভূতলে।
সুমন্ত্র ধরিয়া তাঁরে লইলেক কোলে॥
ভরত রামের শোকে হইল অজ্ঞান।
ভরতের ক্রন্দনেতে বিদরে পরাণ॥
ভরত বলেন গুহ শ্রীরামের মিত।
করিতে তোমার পূজা আমার উচিত॥
যাঁরে কোল দিয়াছেন আপনি শ্রীরাম।
তাঁহারে উচিত হয় করিতে প্রণাম॥
আপনি ভরত তারে দেন আলিঙ্গন।
সুগন্ধি চন্দন দেন বহু মূল্য ধন॥
প্রসাদ পাইয়া গুহ গেল নিজ দেশে।
ভরত গেলেন তবে রামের উদ্দেশে॥

কৃত্তিবাস-পণ্ডিত-বিরচিত রামায়ণ (অযোধ্যাকাণ্ড)।

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ।

ভীম দুর্য্যোধন, করে মহারণ,
দেখে সবে কুতূহল।
দেখিতে সমর, লইয়া অমর,
আইলেন আখণ্ডল॥
চড়িয়া বাহন, করে আগমন,
তেত্রিশকোটী অমর।
যার যেই বেশ, করিয়া বিশেষ,
বসিল যুড়ি অম্বর॥
হংসে পদ্মাসন, বৃষে পঞ্চানন,
পার্ব্বতী কেশরী যানে।
দেব জলেশ্বর, আইল সত্বর,
চড়িয়া নিজ বাহনে॥
হরিণে পবন, নরে বৈশ্রবণ,
মূষিকে বিঘ্ননাশন।
হইয়া কৌতুকী, চাপি মত্ত শিখী,
আইল দেব ষড়ানন॥
সব স্থানে স্থানে, বসিলেন যানে,
দেখেন সমর রঙ্গ।

ভীম দুর্য্যোধন, দোঁহে করে রণ,
উঠিল রণতরঙ্গ ॥
দুই মহাবলী, গদা স্কন্ধে তুলি,
ফিরায় মণ্ডলী করি।
সঘনে গর্জ্জন, করে দুই জন,
যেমন দুই কেশরী ॥
যেন দুই হাতী, ধায় দ্রুতগতি,
পদভরে কাঁপে ক্ষিতি।
দুই বৃষে যেন, করয়ে গর্জ্জন,
কম্পিত শেষাহিপতি ॥
পূরিয়া সন্ধান, কৌরব প্রধান,
ভীমেরে মারিল গদা।
পুষ্পমালা প্রায়, বৃকোদর তায়,
নাহি কিছু পায় ব্যথা ॥
দুই গদাঘাত, যেন বজ্রাঘাত,
ঠনঠনি শব্দ শুনি।
দুর্য্যোধন অঙ্গে, ভীম মহারঙ্গে,
করে গদার ঘাতনি ॥
মহা গদাঘাত, খায় কুরুনাথ,
পড়িল ধরণীতলে।
পড়ি ক্ষণমাত্র, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র,
সেইক্ষণে উঠে বলে ॥

পুনঃ দুই বীরে, গদা ল'য়ে করে,
মণ্ডলী করিয়া ফিরে।
গদার প্রহার, করে মহামার,
দু'জনে মারে দোঁহারে ॥
রাজা দুর্য্যোধন, হয়ে কোপমন,
গদা প্রহারিল ভীমে।
বীর বৃকোদর, কাঁপি থর থর,
সঘনে পড়িল ভূমে ॥

* * *

দৈবের বারণ, না যায় খণ্ডন,
দুর্য্যোধন লাফ দিতে।
ভীম পদাঘাত, যেন বজ্রাঘাত,
বাজে তাহার উরুতে ॥
লোক দেখে রঙ্গে, দুই উরু ভঙ্গে,
ভূমে পড়ে দুর্য্যোধন।
দেখি দেবগণ, চমৎকৃত মন,
ভীম করে আস্ফালন ॥

কাশীরাম দাস।

শ্রীচৈতন্যের শৈশব।

এই মত দিনে দিনে শচীর কুমার।
বাড়য়ে শরীর খানি অমিয়ার ধার * ॥
কি দিব উপমা কিছু না দিলে সে নারি।
খল্ বল্ করে প্রাণ না কহিলে মরি ॥
নিতি † ষোলকলাপূর্ণ ইন্দু মুখচন্দ্র।
সাধে দেখিবারে ধায় জনমের অন্ধ ॥
আবেশ অধরে আধ মুচকি হাসিতে।
অমিয়া সাগর যেন হিল্লোল সহিতে ॥
শচী পুণ্যবতী জগন্নাথ ভাগ্যবান্।
সাদরে নিরখে দোঁহে পুত্রের বয়ান ॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে খটি করে ‡।
ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে ॥
শচী-উরঃস্থলে দুই চরণ রাখিয়া।
দোলে যেন সোণার লতিকা বায়ু পাঞা ॥
অতি দীর্ঘ নয়ন সুন্দর অট্ট হাসি।
অধরে অমিয়া যেন ঢালিছেন শশী।
নাসিকা শুকের ওষ্ঠ জিনি মনোহর।
গণ্ডযুগ জ্যোতির্ম্ময় গটল সোসর § ॥

ধারা। † নিত্য। ‡ আবদার। § সদৃশ।

এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে।
নামকরণ অন্নপ্রাশন দিবসে॥
পুত্র মহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর।
অলঙ্কারে ভূষিল সোণার কলেবর॥

লোচন দাস।

এই মত দিনে দিনে শ্রীশচীনন্দন।
হাঁটিয়া করয়ে সদা অঙ্গনে ভ্রমণ॥
আজানুলম্বিত ভুজ অরুণ অধর।
সকল লক্ষণযুক্ত বক্ষ পরিসর॥
সহজে অরুণ দেহ গৌর মনোহর।
বিশেষ অঙ্গুলি কর চরণ সুন্দর॥
বালক স্বভাবে গোরা যবে চলি যায়।
রক্ত পড়ে হেন দেখি মায়ে ত্রাস পায়॥
দেখি শচী জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত।
নির্ধন তথাপি দোঁহে মহা আনন্দিত॥
কানাকানি করে দোঁহে নির্জ্জনে বসিয়া।
কোন মহাপুরুষ বা জন্মিল আসিয়া॥
এমন শিশুর রীত কভু নাহি শুনি।
নিরবধি নাচে হাসে শুনি হরিধ্বনি॥
তাবৎ ক্রন্দন করে প্রবোধ না মানে।
বড় করি হরিধ্বনি যাবৎ না শুনে॥

ঊষাকাল হইলে যতেক নারীগণ।
বালক বেড়িয়ে সবে করে সংকীর্ত্তন ॥
হরি বলি নারীগণে দেয় করতালি।
নাচে গৌর সুন্দর বালক কুতূহলী * ॥
হেন অঙ্গভঙ্গী করি নাচে গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ ॥
নিরবধি ধায় শিশু কি ঘর বাহিরে।
পরম চঞ্চল কেহ ধরিতে না পারে ॥
একেশ্বর † বাড়ীর বাহিরে কভু যায়।
খই কলা সন্দেশ যা দেখে তাই চায় ॥
দেখিয়া গোরার রূপ পরম মোহন।
যে জন না চিনে সেহ দেয় ততক্ষণ ॥
সবাই সন্দেশ কলা দেহেন গোরারে।
পাইয়া সন্তোষ শিশু আসিলেন ঘরে ॥
যে সকল স্ত্রীগণে গায়েন হরিনাম।
তা সবারে আনি সব করেন প্রদান ॥
বালকের বুদ্ধি দেখি হাসে সর্ব্বজন।
হাততালি দিয়া হরি বলে অনুক্ষণ ॥

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর।

---

* আনন্দিত। † একাকী।

কৈলাস-বর্ণন।

কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর,
কোটি শশী পরকাশ,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর,
অপ্সরোগণের বাস।
তরু নানা জাতি, লতা নানা ভাতি,
ফল ফুলে বিকসিত,
বিবিধ বিহঙ্গ, বিবিধ ভুজঙ্গ,
নানা পশু সুশোভিত।
অতি উচ্চতরে, শিখরে শিখরে,
সিংহ সিংহনাদ করে,
কোকিল হুঙ্কারে, ভ্রমর ঝঙ্কারে,
মুনির মানস হরে।
মৃগ পালে পাল, শার্দ্দূল রাখাল,
কেশরী হস্তিরাখাল,
ময়ূর ভুজঙ্গে, ক্রীড়া করে রঙ্গে,
ইন্দুরে পোষে বিড়াল।
সবে পিয়ে সুধা, নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা,
কেহ না হিংসয়ে কারে,
যে যার ভক্ষক, সে তার রক্ষক,
হেন দৃশ্য চারি ধারে।

সম ধর্ম্মাধর্ম্ম, সম কর্ম্মাকর্ম্ম,
শক্র মিত্র সমতুল,
জরা মৃত্যু নাই, অপরূপ ঠাঁই,
কেবল সুখের মূল।
চৌদিকে দুস্তর, সুধার সাগর,
কল্পতরু সারি সারি,
মণি-বেদি' পরে, মণিময় ঘরে,
বসি গৌরী ত্রিপুরারি।

ভারতচন্দ্র।

গৌরীর রূপ।

হিমালয়ে বাড়েন চণ্ডিকা।
আন বেশ দিনে দিনে শোভা অলঙ্কার বিনে
দেখি সুখী হইল মেনকা॥
অধর বন্ধূক বন্ধু বদন শারদ-ইন্দু
কুরঙ্গ গঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দূর ফোঁটা
তনু-রুচি ভুবনমোহন॥

নাসাতে দোলয়ে মোতি হীরায় জড়িত তথি
বদন-কমলে ভাল সাজে।
তুলনা যে দিতে নারি তাহে অতি মনোহারী
তারা যেন সুধাকর মাঝে॥
গৌরীর বদন-শোভা লিখিতে না পারি কিবা
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।
ম্লান চাঁদ সেই শোকে না বিচারি সর্ব্বলোকে
মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা॥
গৌরীর দশন রুচি দেখিয়া দাড়িম্ব বীচি
মলিন হইল লজ্জাভরে।
অনুমান করি মনে ওই শোকের কারণে
পক্ককালে দাড়িম্ব বিদরে॥
শ্রবণ উপর দেশে হেম মুকুলিকা ভাসে
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত কেশ-পাশে।
আষাঢ়িয়া মেঘ-মাঝে যেন সৌদামিনী সাজে
পরিহরি চপলতা দোষে॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

সুচারু বিশ্ব।

মরি কিবা শোভাময় এ ভব-ভবন
যখন যে দিকে চাহি, জুড়ায় নয়ন।
দিবানিশি রবি শশী প্রকাশি গগনে,
ভুবন উজ্জ্বল করে বিমল কিরণে!
স্থলজ কুসুমজালে শোভা করে স্থল,
কমলে শোভিত কিবা সরসী কোমল।
শ্যামল বিটপিদল কিবা শোভা ধরে!
লতার ললিত রূপ আঁখি মুগ্ধ করে।
বারিধির ভীম রূপ শোভার ভাণ্ডার,
হেরিয়া না হয় মন বিমোহিত কার?
যে করেছে কোন দিন গিরি আরোহণ,
সে জানে ভূধর-শোভা বিচিত্র কেমন!
কোন স্থানে বেগবতী স্রোতস্বতিগণ,
অধোমুখে খরবেগে বহে প্রতিক্ষণ।
স্থানে স্থানে কত শত কন্দরনিকরে,
অহহ! স্বভাব কিবা চারু শোভা ধরে!
কোন স্থানে চরিতেছে মাতঙ্গের দল,
কোন স্থানে ক্রীড়া করে কুরঙ্গ সকল।
এইরূপ জগতের শোভা সমুদয়,
ভাবি, ভাবরসে ভাসে ভাবুক নিচয়।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

পিতা-পুত্র।

(১)

কায়কোবাদের রাজত্ব যবে—
প্রজা করে হাহাকার !
বাদ্‌শা থাকেন প্রমোদোৎসবে
কে দেখে তাদের আর ?
কোথা বল্‌বন্‌ গিয়াসুদ্দীন
হায়রে তাহার বংশ
পাবে বুঝি লোপ, গৌরব তার
হবে বুঝি হায় ধ্বংস !
কুমন্ত্রী যত কায়কোবাদেরে
যাহা বলে তাই করে,
প্রতাপে তাহার সুহৃৎ স্বজন
সকলেই ভয়ে মরে।

(২)

নাশের উদ্দীন ছিল তার পিতা
বাংলায় সেইক্ষণ,
কায়কোবাদের কুযশে তাঁহার
হইল ক্ষুণ্ণ মন।

লিখিলা পত্র। বুঝিলা যখন
মসীতে হবেনা ফল
ধরি অসি চলে শাসিতে পুত্রে
লইয়া সৈন্য দল।
ফেলিল শিবির নাশের উদ্দীন
ঘর্ঘরা নদীতীরে।
সম্রাট্-ফৌজ সমর লাগিয়া
ত্বরায় তথায় ভিড়ে!

(৩)

সমুখ সমরে নিজ আত্মজে
কেমনে হানিবে তীর
স্নেহময় পিতা নাশের উদ্দীন
ভাবি হন্ অস্থির!
তিন দিন ধরি চলিল কেবল
পত্রের বিনিময়—
লিখে পিতা শেষে, "পুত্র আমার,
মানিলাম পরাজয়!
কিছু নাহি চাহি মাগি দরশন—
একবার দেখা দাও!
তার পর তুমি আপন রাজ্যে
গৌরবে ফিরে যাও!"

(৪)

কায়কোবাদের গলিল হৃদয়,
পিতারে পাঠাল কহি,
দিবে দেখা তাঁরে সম্রাট্ বেশে
সিংহাসনেতে রহি !
কিন্তু যখন নাশের উদ্দীন
পশিলা শিবিরে আসি,-
কোথায় রহিল রাজ-গৌরব
গরব গেলরে ভাসি ;
পিতার চরণে লুটিয়া কাঁদিল
ব্যথিত কায়কোবাদ,
সিংহাসনেতে বসায়ে পিতারে
মিটাল বিসম্বাদ !

(৫)

দুর্ম্মতি তার করিবারে দূর
মধুর বচন কত
কহিল তাহারে নাশের উদ্দীন।
হইল সে সম্মত—
মানিয়া চলিতে পিতার বাক্য
করিতে সংশোধন
নিজ চরিত্র—তখন নাশের
ফিরেন হৃষ্ট মন।

বৎসর যবে হইল অন্ত,
শুনে নাশেরুদ্দীন
পুত্র নিহত—খাল্‌জী-পতাকা
দিল্লীতে উড্ডীন!

মস্তক-বিক্রয়।

কোশল নৃপতির তুলনা নাই,
জগৎ জুড়ি' যশোগাথা;
ক্ষীণের তিনি সদা শরণঠাঁই
দীনের তিনি পিতামাতা।
সে কথা কাশিরাজ শুনিতে পেয়ে
জ্বলিয়া মরে অভিমানে;—
"আমার প্রজাগণ আমার চেয়ে
তাহারে বড় করি মানে!
আমার হ'তে যার আসন নীচে
তাহার দান হ'ল বেশি!
ধর্ম্ম দয়ামায়া সকলি মিছে
এ শুধু তার রেষারেষি।"

কহিলা "সেনাপতি, ধর কৃপাণ,
সৈন্য কর সব জড়!
আমার চেয়ে হবে পুণ্যবান্,
স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে বড়!"
চলিল কাশিরাজ যুদ্ধসাজে,—
কোশলরাজ হারি' রণে
রাজ্য ছাড়ি দিয়া ক্ষুব্ধ লাজে
পলায়ে গেল দূর বনে!
কাশীর রাজা হাসি' কহে তখন
আপন সভাসদ মাঝে—
"ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন
তারেই দাতা হওয়া সাজে।"

সকলে কাঁদি বলে—"দারুণ রাহু
এমন চাঁদেরেও হানে!
লক্ষ্মী খোঁজে শুধু বলীর বাহু
চাহেনা ধর্ম্মের পানে!"
"আমরা হইলাম পিতৃহারা"—
কাঁদিয়া কহে দশদিক্—
"সকল জগতের বন্ধু যাঁরা
তাঁদের শত্রুরে ধিক্!"

শুনিয়া কাশিরাজ উঠিল রাগি'
"নগরে কেন এত শোক !
আমি ত আছি তবু কাহার লাগি
কাঁদিয়া মরে যত লোক।
আমার বাহুবলে হারিয়া তবু
আমারে করিবে সে জয় !
অরির শেষ নাহি রাখিবে কভু
শাস্ত্রে এই মত কয় !
মন্ত্রী, রটি' দাও নগর মাঝে
ঘোষণা কর চারিধারে—
যে ধরি' আনি দিবে কোশলরাজে
কনক শত দিব তারে !"
ফিরিয়া রাজদূত সকল বাটী—
রটনা করে দিনরাত।
যে শোনে, আঁখি মুদি' রসনা কাটি'
শিহরি কানে দেয় হাত !

রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে
মলিন চীর দীনবেশে।
পথিক একজন অশ্রুনীরে
একদা শুধাইল এসে,—

"কোথাগো বনবাসী বনের শেষ,
কোশলে যাব কোন্ মুখে ?"
শুনিয়া রাজা কহে, "অভাগা দেশ,
সেথায় যাবে কোন্ দুখে ?"

পথিক কহে, "আমি বণিক জাতি,
ডুবিয়া গেছে মোর তরী।
এখন দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি'
কেমনে রব প্রাণ ধরি !

করুণা-পারাবার কোশলপতি
শুনেছি নাম চারিধারে,
অনাথনাথ তিনি দীনের গতি,
চলেছে দীন তাঁরি দ্বারে !"

শুনিয়া নৃপসুত ঈষৎ হেসে
রুধিলা নয়নের বারি,
নীরবে ক্ষণকাল ভাবিয়া শেষে
কহিলা নিঃশ্বাস ছাড়ি—

"পান্থ যেথা তব বাসনা পূরে
দেখায়ে দিব তারি পথ।
এসেছে বহুদুখে অনেক দূরে
সিদ্ধ হবে মনোরথ।"

বসিয়া কাশিরাজ সভার মাঝে ;
দাঁড়াল জটাধারী এসে।
"হেথায় আগমন কিসের কাজে ?"
নৃপতি শুধাইল হেসে।

"কোশলরাজ আমি, বন-ভবন,"
কহিলা বনবাসী ধীরে,—
"আমারে ধরা পেলে যা' দিবে পণ
দেহ তা মোর সাথীটিরে !"

উঠিল চমকিয়া সভার লোকে,
নীরব হ'ল গৃহতল.
বর্ম্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে
অশ্রু করে ছলছল।

মৌন রহি' রাজা ক্ষণেক তরে
হাসিয়া কহে—"ওহে বন্দী,
মরিয়া হবে জয়ী আমার পরে
এমনি করিয়াছ ফন্দি !

তোমার সে আশায় হানিব বাজ,
জিনিব আজিকার রণে,
রাজ্য ফিরি দিব, হে মহারাজ,
হৃদয় দিব তারি সনে।"

জীর্ণ চীর-পরা বনবাসীরে
বসাল নৃপ রাজাসনে,
মুকুট তুলি' দিল মলিন শিরে,
ধন্য কহে পুরজনে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাঙালিনী।

আনন্দময়ীর আগমনে,
আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে!
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি
কানে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন;
চারিদিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড় ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক তপন!

কত কে-যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশভূষা—
ঝলকিছে কাঞ্চন রতন,—
কত পরিজন দাস্ দাসী,
পুষ্পপাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপর পড়িতেছে
মরীচিকা ছবির মতন।
হের তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।
শুনেছে সে ; মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে।
মা'র মায়া পায়নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে!
তাই বুঝি আঁখি ছলছল
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা,
চেয়ে যেন মার মুখ পানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে—"মাগো এ কেমন ধারা!
এত বাঁশি এত হাসিরাশি,
এত তোর রতন ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী
মোর কেন মলিন বসন!"

ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি,
ভাইবোন করি গলাগলি,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই ;
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে
"আমি ত ওদের কেহ নই !
স্নেহ ক'রে আমার জননী
পরায়ে ত দেয়নি বসন
প্রভাতে কোলেতে করে নিয়ে
মুছায়ে ত দেয়নি নয়ন।"
আপনার ভাই নেই বলে'
ওরে কিরে ডাকিবে না কেহ !
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কিরে করিবে না স্নেহ ?
ওকি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে,
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে !
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব !

দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল কলস!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হাতেমতাই।

ইমন্ দেশেতে নরপতি এক দানশীল খ্যাতিমান্
মেঘের মতন অবিরতধারে করিতেন ধন দান।
সোনার প্রাসাদ, গালিচা-দুলিচা কিংখাব দিয়ে ঢাকা।
রতন প্রাচীরে রঙীন্ জহরে কত ফুলপাতা আঁকা!
স্ফটিকস্বচ্ছ কুট্টিম যেন দরপণ একখান—
সুগন্ধি বাতি জ্বলে সারারাতি, ছুটে উৎসের গান!
এমনি অতুল বিভব তাঁহার, কুবেরের মত ধন
দানেও তেমনি—দুই হাতে টাকা করিতেন বিতরণ!

একদা নগরে দীন দুঃখী সবে ডাকিয়া মহোৎসবে,
নিজ হাতে রাজা মুঠায় মুঠায় বিতরেন ধন যবে—
সহসা সবার গুঞ্জন মাঝে কে যেন বলিয়া উঠে,
"রাজা আমাদের হাতেমের মত!" রাজার কর্ণপুটে

বিষের মতন পশিল সে কথা। দানশীলতায় তাঁরে
হাতেম জিতিয়া রহিবে, ইহা কি নৃপতি সহিতে পারে ?
কিঙ্করে ডাকি' গোপনে তাহারে জানালেন অভিলাষ—
"হাতেমমুণ্ড সেই রজনীতে দেখিবারে তাঁর আশ!"

জনতা ছাড়ায়ে নগরপ্রান্তে চলে কিঙ্কর একা—
দৈবাৎ সেথা সুপুরুষ এক যুবাসনে তার দেখা!
এমন মধুর বচন তাহার, এমন বিনয় মরি,
ফুলভারে আছে যেন মধুময় হৃদয় তাহার ভরি!
কিঙ্করে তুষি' দু'দণ্ডে তারে প্রাণের সুহৃৎ মত
করে ব্যবহার, ঘরে ল'য়ে রহে পরিচর্য্যায় রত।
কি করিয়া তারে করিবে যে সেবা ভাবিয়া না পায় যেন—
ভাবে কিঙ্কর, পৃথিবীতে কভু আছে কি সুজন হেন ?

সেদিন রজনী অমনি কাটিল; পরদিন উঠি প্রাতে
কিঙ্কর স্মরে রাজার আদেশ। কি ক'রেছে গত রাতে ?
রাজাজ্ঞা সে যে গিয়াছে ভুলিয়া, এখন হিসাব তার
মাগিলে নৃপতি—কি বলিবে তাহা ভাবিয়া না পায় আর!
যুবক তাহারে দিন দুই আরো থাকিবার লাগি বলে—
এমন করুণ মিনতি তাহার, এড়াবে যে কোন ছলে
এহেন সাধ্য রহিল না আর। কিঙ্কর অবশেষে,
জানাল সে চলে কি আদেশ বহি, কোথায়, কি উদ্দেশে!

শুনি কহে যুবা হাসিয়া, "বন্ধু, হাতেম আমারি নাম।
তোমার সেবার লাগিয়া আমার মুণ্ডও সঁপিলাম।
তরবারিঘাতে করহ ছিন্ন! এখনো রজনী আছে,
সব পুরজন এখনো মগন গভীর নিদ্রা মাঝে!"
কি করিল তবে কিঙ্কর! হায়, ফুলভারে অবনতা
ঝড়ের আঘাতে ভূমিতে লুটায় যেমন মাধবীলতা—
তেমনি করিয়া নয়নের জলে চুমিল চরণ তার।
কহিলা, "বন্ধু, আমারি মুণ্ড দিব তোমা উপহার!"

ফিরে গেল রাজভৃত্য একাকী। কহিলা ইমন-ভূপ,
"কিঙ্কর! আজ দেখাও আমারে একি রীতি অপরূপ?
কাল রজনীতে হাতেম-মুণ্ড আনিতে পাঠানু, আজ
ফিরিলে শূন্যহাতে?" কিঙ্কর কহে তাঁরে "মহারাজ!
পারি নাই আমি হাতেমের সাথে, করেছে সে মোরে জয়!"
রাজা কহে "সেকি? তীক্ষ্ণ তূণীর শাণিত কৃপাণচয়
দিলাম তোমারে, বীর তুমি, শেষে তোমারি হইল হার?
তবু শুনি কথা, হইবে দণ্ড পরে যাহা হইবার!"

কহে কিঙ্কর সকল কাহিনী। রাজার নয়নে জল
ঘনবারিভার মেঘের মতন করি উঠে ছলছল।
কহিল ভৃত্য, "হারিয়াছি প্রভু, হের এ পৃষ্ঠ মোর
আদরের ভারে হয়েছে বক্র, ঝরি পড়ে আঁখিলোর—

প্রেমের তীরেতে বিক্ষত তাহা—ভক্তিতে জানু নত !
কি দিবে দণ্ড দেহ মহারাজ, আমি আজি পরাভূত !”
রাজা কহে, “ওগো কিঙ্কর, এই দণ্ড আমার লহ
হাতেমেরে গিয়া রাজপ্রণয়ের বার্ত্তা এখনি কহ !”

যথার্থ ভক্ত।

মক্কা মাঝে মুসলমান-ভজনালয় দ্বারে
ভক্ত জলপাত্র লয়ে রহিত এক ধারে।
নমাজ আগে অজুর লাগি মাগিত যারা জল
নিজের হাতে ধোয়ায়ে দিত তাদের পদতল।
মস্জিদের ভিতরে কভু দেখেনি কেহ তারে,
পড়িত না সে নমাজ, পড়ি’ রহিত এক ধারে।

একদা তারে কাফের ভাবি করিল সবে তাড়া—
“নমাজ নাহি পড়ে এ লোক, দেখিনি হেন ধারা ?”
কহিল সবে “চলিয়া যারে, ওরে ধরমহীন !”
ভক্ত কহে “কোথায় যাব, আমি যে বড় দীন !
মস্জিদের বাহিরে আছি একটি কোণে পড়ি !
দোহাই হজরতের, মোরে দিওনা দূর করি !”

তখনি তারে হজরতের নিকটে লয়ে যায় ;
শুনিয়া তার বারতা, তিনি জিজ্ঞাসেন তায়—
"নমাজ তুমি পড়না কেন ?" ভক্ত কহে শুনি,
"আমি যে দীন, মহাত্মন্ ! আছেন যাঁরা গুণী
তাঁদের পদ ধোয়ায়ে দিয়া ধন্য মোর প্রাণ !
আমার মুখে সাজে কি প্রভু, আল্লাগুণগান ?"

শুনিয়া হজরত তাঁরে করেন আলিঙ্গন।
কহেন, "শ্রেষ্ঠ উপাসক এই ভক্তজন।
ইহার এই নম্রতাই সত্য উপাসনা
সবার পদ-সেবায় সুখ লভেছে কোন জনা ?"
হজরতের নয়ন বাহি' পুলকধারা ঝরে
আনন্দেতে বদনে তাঁর বচন নাহি সরে !

জীবন-সঙ্গীত।

বলোনা কাতরস্বরে "বৃথা জন্ম এসংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন ;
দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমার,
বলে জীব করো না ক্রন্দন।

মানব জনম সার, এমন পাবে না আর
বাহ্য দৃশ্যে ভুলোনা রে মন !
কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,
ওহে জীব কর আকিঞ্চন।

করোনা সুখের আশ, পরোনা দুখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয় ;
সংসারে সংসারী সাজ কর নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যাতে হয়।

দিন যায়, ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায়, নাহি রহে স্থির ;
সহায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন শৈবালের নীর।

সংসার সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে
ভয়ে ভীত হয়োনা মানব ;
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান্, যায় যাবে যাক্ প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্ল্লভ।

মনোহর মূর্ত্তি হেরে, ওহে জীব অন্ধকারে,
ভবিষ্যতে করোনা নির্ভর ;
অতীত সুখের দিনে, পুনঃ আর ডেকে এনে
চিন্তা ক'রে হ'ওনা কাতর।

সাধিতে আপন ব্রত স্বীয় কার্য্যে হও রত
একমনে ডাক ভগবান্ ;
সঙ্কল্প সাধন হবে, ধরাতলে কীর্ত্তি রবে,
সময়ের সার বর্ত্তমান।

মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে' গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়
সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।

সময় সাগর-তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে,
আমরাও হব হে অমর ;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে, অন্য কোন জন পরে
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।

করো না মানবগণ বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার-সমরাঙ্গন মাঝে,
সঙ্কল্প করেছ যাহা সাধন করহে তাহা
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নগরলক্ষ্মী ।

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তিপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে,
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে
"ক্ষুধিতেরে অন্নদান সেবা
তোমরা লইবে বল কেবা ?"

শুনি তাহা রত্নাকর শেঠ
করিয়া রহিল মাথা হেঁট ।
কহিল সে কর যুড়ি— "ক্ষুধার্ত্ত বিশাল পুরী,
এর ক্ষুধা মিটাইব আমি
এমন ক্ষমতা নাই স্বামী !"

কহিল সামন্ত জয়সেন—
"যে আদেশ প্রভু করিছেন
তাহা লইতাম শিরে যদি মোর বুক চিরে
রক্ত দিলে হ'ত কোন কাজ,
মোর ঘরে অন্ন কোথা আজ ?"

নিঃশ্বাসিয়া কহে ধর্ম্মপাল
"কি কব, এমন দগ্ধ ভাল,

আমার সোণার ক্ষেত শুষিছে অজন্মা-প্রেত,
রাজকর যোগান কঠিন,
হয়েছি অক্ষম দীনহীন।”

রহে সবে মুখে মুখে চাহি,
কাহারও উত্তর কিছু নাহি।
নির্ব্বাক্ সে সভাঘরে, ব্যথিত নগরী পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি!

তখন উঠিল ধীরে ধীরে
রক্তভাল লাজনম্রশিরে
অনাথপিণ্ডদ-সুতা বেদনায় অশ্রুপ্লুতা
বুদ্ধের চরণরেণু ল’য়ে
মধুকণ্ঠে কহিল বিনয়েঃ—

“ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া!
কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা;
নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।”

বিস্ময় মানিল সবে শুনি’;—
“ভিক্ষুকন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী—

কোন্ অহঙ্কারে মাতি লইলে মস্তক পাতি
এ হেন কঠিন গুরুকাজ।
কি আছে তোমার, কহ আজ !"

কহিল সে নমি' সবা কাছে—
"শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে !
আমি দীনহীন মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে
তাই তোমাদের পাব দয়া
প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া।

"আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে,
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা !"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিশিষ্ট

টীকা

পৃষ্ঠা ১ — পারস্য সাহিত্য ও ইতিহাস যেরূপ অলঙ্কৃত হইয়াছিল,—যেরূপ অলঙ্কার বা গহনা দেহকে সজ্জিত করে, সেইরূপ পারস্য ভাষায় লিখিত গদ্য পদ্যাদি রচনা এবং ইতিহাস মূল্যবান ভাষা ও ভাবের দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল। পণ্ডিত ব্যক্তিগণই সাহিত্য ও ইতিহাসকে সেই অলঙ্কারে সজ্জিত করেন।

পৃষ্ঠা ১ — দার্শনিক—দর্শন বলিতে জ্ঞান বুঝায়, দর্শনশাস্ত্র অর্থাৎ জ্ঞানশাস্ত্র। এই দর্শন বা জ্ঞান যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারা দার্শনিক। যাঁহারা দশনশাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝেন তাঁহাদিগকেও দার্শনিক বলা যায়।

পৃষ্ঠা ১ — বৈজ্ঞানিক—বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান; পদার্থের তত্ত্ব নির্ণীত করে যে শাস্ত্র তাহাই বিজ্ঞান শাস্ত্র। বিজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিকে বৈজ্ঞানিক কহে।

পৃষ্ঠা ২ — প্রতিকৃতি—(প্রতি-পুনর্ব্বার কৃ করা+তি (ক্তি) ণ) প্রতিমূর্ত্তি। সাদৃশ্য।

পৃষ্ঠা ৩ — চতুর্দ্বারবতী—চারিটি দরজা যাহার আছে।

পৃষ্ঠা ৪ — স্বর্ণাস্তরশোভিত—সোণার আচ্ছাদনের দ্বারা শোভাযুক্ত।

পৃষ্ঠা ৪ — সামরিক প্রবৃত্তি—যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা।

পৃষ্ঠা ৪ — রসগ্রাহিতা—এস্থানে রস বলিতে কাব্যের আস্বাদন

বুঝাইতেছে। রস নয় প্রকার, শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্ত, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র, শান্ত। রসগ্রাহিতার অর্থ রস গ্রহণের শক্তি।

পৃষ্ঠা ৪ পাদপূরণ—পাদ, শ্লোকের চতুর্থাংশ পূরণ।

পৃষ্ঠা ১৫ উপনিষৎ—বেদের শিরোভাগ, বেদের যে অংশে ঈশ্বরের কথা আছে, জ্ঞানকাণ্ড, বেদান্ত; উপনিষৎ-বিদ্যা আর্য্যগণের শ্রেষ্ঠবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তিত।

পৃষ্ঠা ১৬ একেশ্বরবাদ—বাদ অর্থে কোন প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য বিচার বুঝায়। এক ঈশ্বর আছেন, দ্বিতীয় নাই এই মতকে একেশ্বরবাদ বলা যায়।

পৃষ্ঠা ১৮ ব্রহ্মজ্ঞান—উপনিষদে বা বেদান্তে এই ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা ব্রহ্ম জ্ঞানের কথা আছে। ব্রহ্মের অর্থ ঈশ্বর।

পৃষ্ঠা ১৯,২০ নূতন বাইবেল, পুরাতন বাইবেল—খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল শাস্ত্রের মধ্যে পুরাতন বাইবেল ও নূতন বাইবেল এই দুই ভাগ আছে। পুরাতন বাইবেল মহাপুরুষ খৃষ্টের জন্মিবার পূর্ব্বে রচিত। নূতন বাইবেল খৃষ্টের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত।

পৃষ্ঠা ২৫ ভক্তিপ্রবণতা—ভক্তির দিকে উন্মুখ স্বভাব।

পৃষ্ঠা ২৫ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—কর্ত্তব্য = যাহা করা বিধেয়। কর্ত্তব্যপালন বিষয়ে নিষ্ঠা অর্থাৎ দৃঢ়তা।

পৃষ্ঠা ২৬ নিয়মনিষ্ঠা—নিয়মপালন সম্বন্ধে দৃঢ়তা।

পৃষ্ঠা ২৯ পর্য্যবসিত—নিঃশেষিত, সমাপ্ত।

পৃষ্ঠা ৩১ কাবামন্দির—মুসলমানদিগের মক্কাতীর্থে এই বহু প্রাচীন প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। এখানে একটি কৃষ্ণ শিলা আছে—

যাত্রিগণ উহাকে চুম্বন বা স্পর্শ করেন এবং কাবার চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করেন।

পৃষ্ঠা ৩১ ভাস্কর-তুল্য—সূর্য্যের ন্যায়।

পৃষ্ঠা ৩৭ আনুষঙ্গিক—অন্য বিষয়ের সঙ্গে যাহা ঘটে।

পৃষ্ঠা ৩৮ অশনি—বজ্র।

পৃষ্ঠা ৩৯ কশা—চাবুক।

পৃষ্ঠা ৪২ পাশব বৃত্তি—পশুর ন্যায় বৃত্তি, নিকৃষ্ট বৃত্তি।

পৃষ্ঠা ৪২ হৃদয়োন্মাদক--হৃদয়কে যাহা পাগলের ন্যায় করে।

পৃষ্ঠা ৪৩ চিত্ত-রঞ্জিনী বৃত্তি—যে মনোবৃত্তি বা মানসিক শক্তি অন্তঃকরণে অনুরাগ উৎপাদন করে।

পৃষ্ঠা ৪৫ সংসার পরিত্যাগের সময়—রাজপুত্র সিদ্ধার্থ মানব সংসারে চারিদিকেই দুঃখ দেখিয়া গভীর রাত্রে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

পৃষ্ঠা ৪৬ বুদ্ধগয়া—গয়া সহর হইতে কিছু দূরে গেলেই বুদ্ধগয়া দেখিতে পাওয়া যায়। সেই স্থানে দীর্ঘকাল ধরিয়া বুদ্ধদেব শরীরকে নষ্ট করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। শেষে কৃচ্ছ্র তপস্যা অর্থাৎ কষ্টদায়ক তপস্যার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা রহিল না। তাঁহার শরীর উপবাসে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি উরুবিল্বগ্রামে সুজাতা নাম্নী এক স্ত্রীলোকের নিকট কিছু অন্ন গ্রহণ করিয়া সুস্থ হইলেন।

পৃষ্ঠা ৪৮ প্রাকার—প্রাচীর।

পৃষ্ঠা ৪৯ মর্ম্মর গবাক্ষ—মর্ম্মর প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত জানালা।

পৃষ্ঠা ৫২ কারুকার্য্য—শিল্পকর্ম্ম।

পৃষ্ঠা ৫২ দেওয়ান-ই-আম—মোগল বাদশাহদিগের প্রকাশ্য দরবার-গৃহকে আম দরবার বা দেওয়ান-ই-আম বলা হইত।

পৃষ্ঠা ৫৬ প্রকৃতি-রঞ্জন—প্রকৃতি অর্থে প্রজা। প্রজাকে সন্তুষ্টকরণ।

পৃষ্ঠা ৫৭ চরক—বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদবিৎ ঋষি। ইহাঁর রচিত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থও ঐ নামে প্রসিদ্ধ।

পৃষ্ঠা ৫৭ সুশ্রুত—প্রসিদ্ধ চিকিৎসা-গ্রন্থকার বিশেষ। গ্রন্থেরও ঐ একই নাম।

পৃষ্ঠা ৫৭ শারীর বিদ্যা—শরীর সম্বন্ধীয় জ্ঞান।

পৃষ্ঠা ৬০ উপকণ্ঠ—(উপ-সমীপ কণ্ঠ-গলা) নিকট; সমীপ।

পৃষ্ঠা ৬২ শৌণ্ডিকাপণ—মদের দোকান।

পৃষ্ঠা ৬৭ এডেন—একটি বন্দর। এখানে অধিকাংশ জাহাজ থামে।

পৃষ্ঠা ৬৯ অবরোধ—বেড়ার দ্বারা বেষ্টিত স্থান।

পৃষ্ঠা ৭২ কপোলাস্থিসকল—গালের হাড়গুলি।

পৃষ্ঠা ৭৩ সীল—এক প্রকার জন্তু, মেরু দেশে ইহা দৃষ্ট হয়।

পৃষ্ঠা ৭৩ তদ্দেশীয় ভূপ্রকৃতি—সেই দেশীয় ভূমির যেরূপ প্রকৃতি। কোন ভূমিখণ্ড বিষুবরেখা হইতে দূরে বা নিকটে, সমুদ্র হইতে দূরে বা নিকটে, পার্ব্বত্য বা সমতল ভূমি কিনা, এই সকল নিরূপণের দ্বারা তাহার প্রকৃতি নির্ণীত হয়।

পৃষ্ঠা ৮২ মনঃসংযম—মনোবৃত্তিগুলির সংযম বা দমন। মনোবৃত্তি-গুলিকে নিয়মিত করার শক্তি।

পৃষ্ঠা ৮৯ কটক—রাজধানী।

পৃষ্ঠা ৮৯ ঠাট—সৈন্যশ্রেণী।

পৃষ্ঠা ২৯ মুই—আমি।

পৃষ্ঠা ৯০ দগড়—দামামা।

পৃষ্ঠা ৯০ মিত—বন্ধু।

পৃষ্ঠা ৯২ আখণ্ডল—ইন্দ্র

পৃষ্ঠা ৯৩ শেষাহিপতি—সর্পরাজ বাসুকি।

পৃষ্ঠা ৯৫ শচী—শ্রীচৈতন্যের মাতার নাম

পৃষ্ঠা ৯৫ পাঞা—পাইয়া।

পৃষ্ঠা ৯৮ মৃগ পালে পাল শার্দ্দূল রাখাল—কৈলাস পর্ব্বতে হরিণের পাল চরিয়া বেড়াইতেছে এবং ব্যাঘ্র তাহাদের রাখাল হইয়াছে।

পৃষ্ঠা ৯৮ সম ধর্ম্মাধর্ম্ম সম কর্ম্মাকর্ম্ম—সেথানে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম সমান, কাজ এবং অকাজ সমান—কারণ সেথানে উচ্চ নীচ, ক্ষুদ্র বৃহতের কোন অসমতা নাই—সমস্তই এক।

পৃষ্ঠা ৯৯ বন্ধূক— বাঁধুলি ফুলের গাছ, বাঁধুলি ফুলও বুঝায়।

পৃষ্ঠা ১০০ রুচি—শোভা।

১০০ সৌদামিনী—বিদ্যুৎ।

পৃষ্ঠা ১০১ বিটপী—বৃক্ষ।

পৃষ্ঠা ১০২ বল্‌বন্‌ গিয়াসুদ্দিন—পাঠান রাজত্বকালে দিল্লীতে দাসবংশ নামক এক রাজবংশ বহুকাল ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিল। গিয়াসুদ্দিন বল্‌বন্‌ সেই বংশের একজন বাদশাহ ছিলেন। তিনি খুব প্রতাপান্বিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র কায়কোবাদ দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন এবং কায়কোবাদের পিতা বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। কায়কোবাদ অসচ্চরিত্র যুবক ছিলেন। জালালুদ্দিন খিলিজি তাঁহাকে নিহত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তথন হইতে খিলিজি বংশের শাসন দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পৃষ্ঠা ১১০ আনন্দময়ী—দেবী দশভুজা।

পৃষ্ঠা ১১৩ সহকার—আম্র বৃক্ষ।

পৃষ্ঠা ১১৩ হাতেমতাই—একজন বিখ্যাত দাতা ছিলেন।

পৃষ্ঠা ১১৫ পৃষ্ঠ মোর আদরের ভারে হয়েছে বক্র—
আদরের দ্বারা পিঠ বাঁকিয়া গিয়াছে—আঘাতের দ্বারা নহে।

পৃষ্ঠা ১২২ অনাথপিণ্ডদ—বুদ্ধের একজন ভক্তশিষ্য ছিলেন।

Printed and published by J. C. Ghosh at the Cotton Press, 57, Harrison Road, Calcutta for Messrs S. K. Lahiri & Co.—16-2-16.—X.